যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প

মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন।

এই অভাবপূরণের জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন। ১ বৈশাখ ১৩৫০ হইতে প্রতিমাসে অন্যূন একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।

। প্রকাশিত হইয়াছে ।

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় শ্রীগণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প

মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

১লা চৈত্র, ১৩৫০

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
২১—১৬. ৩. ৪৪

বিষয় সূচী

প্রাথমিক কথা

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর রূপ যে কি হইবে—তাহা এখনই বলা কঠিন, তবে এই মহাসমরের পরিণাম ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন রূপ আশা করিয়া পৃথিবীর পরবর্তী রূপের এক-একটি নূতন পরিকল্পনা উপস্থিত করিতেছে। আমরা বর্তমান যুগে এই বিশ্বব্যাপী মহাসমরের মধ্যে জড়িত হইয়া নানাভাবে দেশের দীনতার কথা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইতিপূর্বে আর একবার যখন এইরূপ দুর্দিন আসিয়াছিল, তখনও আমাদের অসহায়তার কথা এমনি ভাবেই প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছিল এবং ঐ মহাযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ দেশের মধ্যে নানাবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল। বর্তমানের সমস্যা অধিকতর কঠিন, কিন্তু সমাধান অসম্ভব নহে। এই কথা মনে হওয়ায় দেশকে শিল্প-প্রতিষ্ঠান দ্বারা সমৃদ্ধ করিবার কি কি সুযোগ বর্তমান, তাহার পরীক্ষা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে হওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে হইল। সমস্যাটি সমস্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই আলোচ্য, কিন্তু ঐ বৃহত্তর কার্যক্ষেত্রের কথা না ভাবিয়া আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় কেবল বাংলাদেশের সমস্যাটিই আলোচনা করিবার চেষ্টা করিলাম। ইহার কোন কোন অংশ সমস্ত ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কিন্তু সে কথা ভাবিতে গেলে আরও নানাবিধ প্রশ্নের উদয় হইবে। এইজন্য ক্ষুদ্রতর সীমার মধ্যে, কি করিলে আমরা অন্তত এই প্রদেশটিকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিতে পারি, তাহারই আলোচনা করিলাম। এদেশ কৃষিকর্মের জন্য মুখ্যত উপযুক্ত হইলেও, এখানে সাফল্যের সঙ্গে শিল্পালয় গঠিত হওয়া সম্ভব। জগতের কোন দেশই বর্তমানে কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল নহে—পরন্তু কৃষির অধিকতর উৎকর্ষ বিধানের জন্য প্রত্যেক দেশেই একাধিক শিল্পালয় গঠিত হইয়াছে। আমাদের এই বাংলাদেশেও ঐরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন। এই-জন্যই অতীতের দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমানের সহিত খাপ খাইবে না। পুরাতন-পন্থীরা যাহাই মনে করুন না কেন, এই যুগের সভ্যতা নূতনতর উপাদানে

গঠিত। বর্তমানে অতীতের গোশকট যেমন লোকের সুদূরের পথে যাতায়াতের জন্য একেবারেই অচল হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই যন্ত্রযানের সহিত মানবের চিন্তাধারাও দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। কাজেই আমাদের পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বাংলাদেশ সমুদ্র-পারের বিভিন্ন স্থান হইতে বিত্ত সংগ্রহ করিয়া, ও সেই সকল দেশে নিজ পণ্য বিক্রয় করিয়া, অতীতেও সমৃদ্ধ হইয়াছিল। বর্তমানে ইহার সুযোগ অধিকতর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। অতএব ঐ সুযোগ গ্রহণ না করিবার কি অর্থ থাকিতে পারে? এই সুবিধা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া যে সকল প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে পারে, তাহার পূর্ণতর আলোচনা প্রয়োজন।

আলোচনা হইলেই যে উহা কার্যে পরিণত হইতে পারিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই; কিন্তু সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহার আলোচনা না হইলে, কোনদিনই এই সম্ভাবনা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে না। এইজন্যই বর্তমান যুগে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পথ পরিদর্শন করিলে, উহাকে কার্যে পরিণত করিবার যোগ্য লোকও একদিন জন্মাইবে, এই আশায় ভবিষ্যতের এই চিত্রটি অঙ্কিত করা প্রয়োজন মনে হইল। এখানে এইটুকুই বলিতে চাই যে, এ আলোচনা কেবলমাত্র কল্পনাসর্বস্ব নহে, উহাকে প্রত্যক্ষ রূপ দেওয়া, এমন কি বর্তমান অবস্থার মধ্যেও, অসম্ভব মনে করিবার কারণ নাই। তবে যুদ্ধের পর যখন সমস্ত দেশ অপেক্ষাকৃত শান্তমূর্তি ধারণ করিবে, তখন ইহাকে কার্যে পরিণত করা অধিকতর সম্ভব এবং একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িবে।

বাঙালী জাতিকে ভাবপ্রবণ বলিয়া সকলেই উপহাস করে। কথাটাকে মিথ্যা বলিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার সামর্থ্য আমাদের নাই, তবে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেও মন রাজি হয় না। এই ভাব-প্রবণতার দ্বারা বাঙালী সৃষ্টির পথেও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে; কাজেই ভবিষ্যতেও আমাদের চিন্তাধারা যে বাস্তবে রূপায়িত হইয়া উঠিবে না, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। এ কথা অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে যে, এই দীর্ঘকালের কর্মবিমুখতার কুফল বাঙালী এখন বেশ উপলব্ধি

করিতে পারিতেছে। তাহাকে খাদ্যের জন্য আজ যেমন বিদেশীর দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে, বস্ত্রের জন্য তেমনি চিরকালই সে পরমুখাপেক্ষী। বাংলার জন্য মাখন আসিবে—অস্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড ও আলিগড় হইতে। তাহার জন্য রুটি প্রস্তুত হইবে—যুক্তপ্রদেশ কিংবা পাঞ্জাবের গমের সাহায্যে। কেরানী বাঙালী বড়বাবুর পায়ে তৈলমর্দন করিবার জন্য যে খাটি সরিষার তৈলের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে তাহাও তাহাকে সংগ্রহ করিতে হয় প্রদেশান্তর হইতে। তাহার বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র থাকিতেও আজ যে, সমস্ত দেশে দারুণ হাহাকার উঠিয়াছে, তাহাও তাহার নির্বুদ্ধিতার দোষেই। এই সকল অবস্থা দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আশা করি শীঘ্রই তাহার মধ্যে কর্মবিমুখতার পরিবর্তে কার্যতৎপরতা দেখা দিবে।

এতদিন তো অর্থশালী বাঙালী জমিদারি লইয়াই ব্যস্ত ছিল। রাজার সম্মান ও রাজৈশ্বর্যই তাহার কাম্য ছিল, কিন্তু এখন দেখিতেছি অর্থ ঢালিয়াও তাহারা কারখানায় মজুরের কাজে অগ্রসর হইয়াছে। অদূরভবিষ্যতে বাঙালীকে নিশ্চয়ই অধিকতর পরিমাণে ব্যাবসার ক্ষেত্রে নামিতে হইবে। মধ্যবিত্ত বাঙালীর চাকুরি-জীবন আর কেরানীকুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারিবে না। তাহাকে অধিকতর অর্থ উপার্জন করিতে হইলে শিল্পালয়ে যোগ দিতেই হইবে। ইহা ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। কাজেই আমার আশা করা হয়তো অন্যায় হইবে না যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার পরিকল্পনাগুলি অন্তত কতকগুলি কর্মী যুবককেও বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিতে প্রেরণা দানে সমর্থ হইবে। এই আশা লইয়াই পুস্তিকাখানি প্রকাশের জন্য অগ্রসর হইয়াছি।

বাংলাদেশ কি শিল্পালয়ের জন্য উপযুক্ত ?

অতীতের বাংলা প্রধানত কৃষিকার্যোপযোগী ছিল ; আজিও অনেকে মনে করেন যে, নদীমাতৃক এই শ্যামলভূমিটি একমাত্র কৃষির উপযোগী ক্ষেত্র। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই বাংলার বক্ষে নানাবিধ শিল্পালয় ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে ও তাহাদের অনেকগুলিই বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। দুঃখের বিষয় কোন বিশিষ্ট গঠনমূলক জাতীয় পরিকল্পনা লইয়া এই শিল্পালয়গুলি স্থাপিত হয় নাই, পরন্তু যেখানে সেখানে এলোমেলোভাবে এইগুলির উদ্ভব হওয়ায় ইহাদের মধ্যে আন্তরিক যোগাযোগের অভাব রহিয়াছে। জাতীয় প্রয়োজনের কথা ভাবিয়া এইগুলিকে স্থাপন করিতে হইলে, দেখা প্রয়োজন—কাছাকাছি যাহারা অবস্থান করিবে, তাহারা যেন পরস্পরের সহায় হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে উহাদের কোনটিই আশানুরূপ উন্নতিলাভে সমর্থ হইবে না। এইরূপ বিবেচনার অভাব বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই বলিলাম যে, ইহারা কোন জাতীয় পরিকল্পনার প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যখন এই প্রতিষ্ঠানগুলি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তখন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, কৃষিপ্রধান বাংলার মাটিতেও শিল্পালয়ের জন্য যথেষ্ট সুবিধা বর্তমান। এইজন্যই আমরা—যাহারা বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছি, কবিভাবাপন্ন যুবজনের ন্যায় শিল্পালয়ের চিমনির ধূম উদ্‌গিরণের চিত্রে স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় পীড়িত হই না, তাহারা—শিল্পালয় প্রতিষ্ঠার কথায় আতঙ্কিত না হইয়া অনাগত বাঙালী জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধির কথা ভাবিয়া বরং আনন্দ বোধ করি। মনে রাখা প্রয়োজন যে, কৃষি ও শিল্পকার্য পরস্পরবিরোধী নহে। ইহাদের একটি অপরের সহায়। অতএব শিল্পোন্নতি যেমন কৃষি ফলনের অধিকতর উৎপাদনের মুখাপেক্ষী, তেমনই বর্তমান যুগে শিল্পপ্রধান দেশ তাহাদের অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতে উন্নততর সার দিয়া ও আধুনিকতম লাঙ্গল

দ্বারা চাষ করিয়া আশ্চর্যরূপ অধিক ফলন ঘটাইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে এইরূপ উদাহরণের অভাব নাই। বাংলাদেশে ফসলের পরিমাণ ক্রমাগত প্রতি বৎসরই কমিয়া যাইতেছে। এই ক্ষতির প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়া শিল্পপরিচালকের কুশলী হস্তের সাহায্যে ঐ কারণগুলি নিবারণ করিয়া আমাদের কৃষিক্ষেত্রকে অধিকতর উপযোগী করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কৃষিকার্যের দ্বারা বহুবিধ ফসল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারিলে একাধিক শিল্পালয় গঠিত হইতে পারিবে। কাজেই আমার মনে হয় যে, প্রকৃতিদেবীর কল্যাণে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশই শিল্প ও কৃষিকার্য উভয়ের জন্যই উপযুক্ত।

শিল্প নানাবিধ। প্রত্যেকটি শিল্পপরিচালন কার্যে যান্ত্রিক শক্তি ও কাঁচা মালের প্রয়োজন। এই উভয়বিধ উপায়ের ব্যবস্থা না হইলে শিল্পালয় পরিচালন সম্ভব নহে। এই দ্বিবিধ উপায়ের কথা একে একে আলোচনা করিব।

প্রথমত শক্তির কথাই ধরা যাউক। যান্ত্রিক শক্তি বিভিন্ন যুগে ভিন্ন রূপে উৎপাদিত হইয়াছে। মানবের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, আদিম যুগের অপেক্ষাকৃত অধিকতর অসহায় মানুষ নিজদেহ দ্বারা যন্ত্র চালনা করিয়া থাকিত, আজিও সেই আদিম উপায়ই বহু ক্ষেত্রে অবলম্বিত হইতেছে। ক্রমশ দৈহিক পরিশ্রম লাঘবের উদ্দেশ্যে মানুষ হাতে বা পায়ে চালানো কল উদ্ভাবন করে। বর্তমানে কুটীরশিল্প-পরিচালনকারীদের অনেকের গৃহে এইরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু এইরূপ যন্ত্র সহযোগে কার্যের গতি কেবল দেহসহযোগে যাহা হইত তাহা হইতে দ্রুত হইলেও যথেষ্ট দ্রুত হইতে পারে না; শ্রমোৎপন্ন বস্তুর পরিমাণও আশানুরূপ অধিক হয় না। কাজেই কোথাও কোথাও পশ্বাদির সহযোগেও মানব দৈহিক শ্রম লাঘব করিয়া থাকে, কিন্তু এইরূপে অধিকতর কার্য সম্পন্ন হইলেও শ্রমলাঘবের উহা শ্রেষ্ঠতম উপায় নহে। এইজন্য পরে আবার স্টীম-শক্তির সাহায্য লওয়া হইল। স্টীম-শক্তি সহযোগে যেমন সুবৃহৎ রেলগাড়ি টানিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে, তেমনই স্টীম-এঞ্জিন শিল্পালয়ে স্থাপন করিয়া দ্রুততর বেগে শ্রমোৎপন্ন

দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইতেছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ইহাকেও স্থানচ্যুত করিয়া বিদ্যুৎশক্তি কার্যে নিযুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আধুনিকতম যান্ত্রিক শক্তি বলিতে এইজন্যই আমরা বিদ্যুৎশক্তির কথাই ভাবি। এখন দেখা প্রয়োজন এই বিদ্যুৎশক্তি কি এ দেশে সহজলভ্য? অনেকেই মনে করিবেন ইউরোপ বা আমেরিকায় বিদ্যুৎ-শক্তি সহজলভ্য হইলেও এ দেশে উহার কথা চিন্তা করা বাতুলতার সমতুল্য হইবে। কারণ কলিকাতার ন্যায় সুবৃহৎ শহরে, যাহাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী বলিয়া গর্ব করা হয়, সেখানেও দুই আনা ইউনিট দরে বিদ্যুৎ পাইয়াও শিল্পালয় গঠন করা সম্ভব নহে। কাজেই বাংলাদেশের অন্যান্য শহরে আট হইতে বারো আনা পর্যন্ত ইউনিট দরে বিদ্যুৎশক্তি কিনিয়া শিল্পকার্য পরিচালনা করা যে অসম্ভব, সে কথা সকলেই বুঝিতে পারে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, বঙ্গভূমিতে বিদ্যুৎশক্তি সহজলভ্য হওয়া অসম্ভব নয়।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বর্তমানে দ্বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। প্রথম উপায় হইল স্টীম-শক্তি সহযোগে ডাইনামো ঘুরাইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করা, আর দ্বিতীয়, জলশক্তি দ্বারা জল তুর্বিন ঘুরাইয়া অন্যবিধ ডাইনামো হইতে বিদ্যুৎস্রোত উৎপাদন করা। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাংলাদেশে প্রাকৃতিক কল্যাণে এই উভয়বিধ উপায়ই বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে। স্টীমের জন্য প্রয়োজন হয় পাথুরিয়া কয়লা, এবং জলশক্তির জন্য একান্ত আবশ্যক উচ্চভূমি। ইহাদের প্রথমোক্ত পদার্থটি বাংলার পশ্চিম প্রান্তে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং শেষোক্ত উচ্চভূমি সুবিস্তৃত হিমালয়পর্বতরূপে সারা বাংলার উত্তর প্রান্তকে বেষ্টিত করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে।

আসানসোল ও রানীগঞ্জের কয়লার খনি হইতে প্রচুর পরিমাণে পাথুরিয়া কয়লা নিত্য উঠিতেছে। রেলযোগে ইহাকে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চতুর্দিকে প্রেরণ করা হইতেছে। বাংলার প্রতি গৃহে আজ ইহার বহুল ব্যবহার হইতেছে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে,

উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হইলে এই কয়লা বহু শতাব্দী ধরিয়া বাংলাদেশের প্রয়োজন মিটাইতে পারে। কিন্তু বর্তমানে ইহার ব্যবহার প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে হইতেছে না, পরন্তু নানাভাবে ইহার অপব্যয় ঘটিতেছে। প্রথমত কয়লা উত্তোলন সময়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাববশত খনির অধিকারিগণ যে-কোন প্রকারে কিছু কয়লা বাজারে চালাইবার জন্য বাহির করিয়া আনেন, কিন্তু ঐ সঙ্গে যে বিরাট পরিমাণ কয়লার চূর্ণ খনি হইতে উত্তোলিত হয় তাহা প্রায় নষ্ট হইয়া থাকে। অথচ ইউরোপের কোনও খনিতেই এইরূপ ঘটে না। জার্মানিতে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর এক কয়লা পাওয়া যায় উহাকে 'ব্রাউন কয়লা' বলা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে দাহ্যমান পদার্থের তুলনায় জলীয় ভাগ অত্যন্ত অধিক। এই কয়লাও সেখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া মানুষের কাজে লাগিতেছে, অথচ এই দেশের গুঁড়া কয়লার ব্যবহার প্রায় কিছুই নাই বলিলেই চলে। আধুনিকতম স্টীম-এঞ্জিনে গোটা কয়লার পরিবর্তে চূর্ণ কয়লাই দাহ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই গুঁড়া কয়লা দূরদূরান্তে রপ্তানি করা একটু কষ্টসাপেক্ষ এবং বিপদসঙ্কুল, কারণ উহা অতি সামান্য ব্যাপারে জ্বলিয়া উঠিতে পারে। এইজন্য উহাকে খনির কাছাকাছি কোথাও কাজে লাগাইতে পারিলেই সর্বাপেক্ষা সহজে উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। আসানসোলের আশেপাশে যন্ত্র স্থাপন করিয়া এই গুঁড়া কয়লাকে যেমন দাহ্যরূপে ব্যবহার করিয়া বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায়, তেমনি উহার দ্বারা কয়লার ইষ্টক প্রস্তুত করিয়াও দূরদেশে উহাকে প্রেরণ করা সম্ভব। যে ভাবেই হউক, এই চূর্ণ কয়লা নষ্ট না করিয়া উহাকে কার্যে নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে উহার ঐরূপ কোনও নিয়োগ না থাকায় ইহা প্রায় নষ্ট হইয়া থাকে। কেবল মাত্র এইরূপ দাহ্য সহযোগেই প্রচুর পরিমাণে নূতনতর শক্তি তথায় উৎপাদিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত সাধারণ কয়লা তো রহিয়াছে, কাজে কাজেই বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিবার জন্য যে পরিমাণ কয়লার তথায় প্রয়োজন হইবে, তাহার অভাব কোনদিনই ঘটিবে না। এইরূপে উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তি তথা হইতে যেমন কলিকাতায় নীত হইতে পারে,

তেমনই পশ্চিমে ও উত্তরেও কিছুদূর পর্যন্ত উহাকে প্রেরণ করা সম্ভব।

বিদ্যুৎশক্তি বাহিত হয় ধাতব তারের সাহায্যে, এইরূপ বিদ্যুৎবাহী তার আসানসোল হইতে কলিকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত হইলে পথিমধ্যে প্রায় প্রত্যেক স্থানে এই শক্তি সহজলভ্য হইবে। কেবল তাহাই নহে, তখন আর কয়লার সাহায্যে স্টীম-ইঞ্জিন সহযোগে রেলগাড়ির চলাচল প্রয়োজন হইবে না, পরন্তু বিদ্যুৎশক্তি যেমন কলিকাতার ট্রামগুলিকে দ্রুত টানিয়া লইয়া যায়, তেমনি এই শক্তিশালী বিদ্যুৎস্রোত যাত্রী ও মালপূর্ণ ট্রেনগুলিকেও অনায়াসে টানিয়া লইয়া যাইবে।

কয়লা ব্যবহারে নানাবিধ অসুবিধা, তাহার মধ্যে ধূম উদ্‌গিরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বাভাবিক কারণে বাংলার বায়ু পশ্চিমের ন্যায় শুষ্ক নহে। পরন্তু অত্যন্ত অধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্পে পূর্ণ। এই জলীয় বাষ্পের মধ্যে ধূম বর্তমান থাকিলে তাহাকে সহজে অপসারিত করা যায় না। কাজেই ইহা দেশবাসীর স্বাস্থ্য নষ্টের একটি কারণরূপে সর্বদাই আমাদের জাতীয় জীবনকে বিপদাপন্ন করে। আমাদের দেশের বর্তমান পরিচালিত রেলগাড়িগুলি এইরূপে দেশের স্বাস্থ্যকে বিপদাপন্ন করিয়াছে। ইহা ব্যতীত বাংলাদেশে প্রায় প্রত্যেক গৃহে কয়লা ও কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, ইহাতে উদ্গীরিত ধূমের পরিমাণ বাড়িয়াই যায়। এই বিভিন্ন উপায়ে উদ্গীরিত ধূমরাশি একত্র হইয়া বাংলার বায়ুস্তরকে কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যুৎশক্তি সহজলভ্য ও সস্তা হইলে এইসকল বিভিন্ন কারণে কয়লা ও কাঠের ব্যবহার কমিয়া যাইবে, কাজেই তখন আমরা নির্মলতর বায়ু সেবন করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারিব। ইউরোপের মধ্যে সুইষারল্যাণ্ড দেশটি এই হিসাবে অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ তথায় স্টীম-এঞ্জিনের প্রচলন নাই, সমস্ত দেশটি বিদ্যুৎ সাহায্যেই যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে। ট্রেনগুলি সবই বিদ্যুৎ-পরিচালিত। সুইষারল্যাণ্ডে দুই চারি দিন বাস করিয়া ইটালিতে গমন করিলে এই দুই দেশের বায়ুমণ্ডলের পার্থক্য প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ

করে। সুইযারল্যাণ্ড এই জন্যই স্বাস্থ্যনিবাস। ফুসফুস রোগের জন্য এখানে সর্বোত্তম স্বাস্থ্যাগার রহিয়াছে।

যদি পূর্বোক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানই নহে, পশ্চিম বাংলার সমস্ত রেলপথ এই বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত হইয়া সমস্ত দেশকে ধূম, ধূলি ও ভস্ম হইতে রক্ষা করিবে। এই বিদ্যুৎ-ধারা যে পথ দিয়া প্রবাহিত হইবে, তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ বিদ্যুৎশক্তি সহজলভ্য হওয়ায় সর্বত্র ছোট বড় নানারূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠনের সহায়তা হইবে। বাংলাদেশে আবহমানকাল বহুবিধ কুটীরশিল্প চলিয়া আসিতেছে। এই সহজলভ্য শক্তির সাহায্যে তাহারা নূতন প্রেরণা পাইবে। এতদ্ব্যতীত আরও নূতন নূতন বহুবিধ শিল্পালয় ক্রমশ গঠিত হইতে থাকিবে। ইহাদের কথা পরে বিশদরূপে আলোচনা করিব।

জলধারার দুর্জয় শক্তি সহযোগেও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হইয়া থাকে। নায়েগ্রা জলপ্রপাতের প্রচণ্ড শক্তি বিদ্যুৎরূপে রূপান্তরিত হইয়া আমেরিকার একটি বিস্তৃত জনপদকে নানাবিধ শিল্পের জন্য পরম উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। সুইডেন ও সুইযারল্যাণ্ডেও স্বাভাবিক উপায়ে জলশক্তি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ঐ সকল দেশে নানাবিধ শিল্পালয় সহজে গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বাভাবিক জলপ্রপাত না থাকিলে মানুষ নিজ পরিকল্পনার সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে বিরাট জলাধার নির্মাণ করিয়াও জলপ্রপাত প্রস্তুত করিতে পারে। দক্ষিণ ভারতে টাটা কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত ইলেকট্রিক কারখানাটি এইরূপ পরিকল্পনার দ্বারাই নির্মিত হইয়াছে। যদিও এই পরিকল্পনার সূত্রপাতে লোকে উহার প্রতিষ্ঠাতাদের কার্যকে অসম্ভব মনে করিয়া তাহাদিগকে উপহাস করিয়াছিল, তথাপি পরবর্তী কালে ইহা অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিয়াছে, ইহার ফলে দক্ষিণ-ভারতের পুরাতন রূপ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

মহীশূর রাজ্যে নর্মদার জলধারার সাহায্যে এই অল্পদিন পূর্বে প্রচণ্ড বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে ও ইহার সহযোগিতায়

তথায় আধুনিকতম কতকগুলি রাসায়নিক শিল্পালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আমার মনে হয় বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত সুউচ্চ এবং সুবিস্তৃত হিমালয়পর্বতশ্রেণীর পাদদেশেও এইরূপ কতকগুলি জলাধার প্রস্তুত করা সম্ভব। এই কল্পনাকে রূপ দিতে পারিলে সমস্ত উত্তরবঙ্গেও বিদ্যুৎশক্তি সহজলভ্য হইয়া পড়িবে। এই সকল স্থানে বর্তমানে কয়লার সাহায্যে স্টীম উৎপাদন করিয়া শিল্পালয় পরিচালন করা অপেক্ষাকৃত অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ। কাজেই বিদ্যুৎ সহযোগে নূতন শিল্পালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই প্রদেশকে সম্পদ্‌শালী করিবে।

পশ্চিমবঙ্গে দামোদর নদের বিপুল জলধারা প্রতি বৎসর নানাবিধ অনর্থের সৃষ্টি করে। রাঁচি ও হাজারিবাগের গিরিগাত্র বাহিয়া বাংলাদেশের সমভূমিতে অবতরণ করিবার পূর্বে যদি অন্তত আংশিকভাবে ঐ জলরাশিকে আবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে হঠাৎ বন্যা নামিয়া বর্ধমান ও হুগলি জেলায় বাৎসরিক যে অনর্থ ঘটায়, তাহা আর ঘটাইতে পারিবে না। অথচ ঐ জলরাশি আবদ্ধ হইলে পরে উহাকে ইচ্ছানুরূপ বেগে দামোদর বক্ষে নামিতে দিলে তাহার সাহায্যেও বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিম সীমান্তে নবীন বিদ্যুৎধারা উৎপাদিত হইতে পারে। অধিকন্তু এই বিপুল জলরাশির কিয়দংশ অপেক্ষাকৃত নিম্নতর ভূমিতে আর একটি দ্বিতীয় জলাধারে আবদ্ধ করিলে দামোদরের অতর্কিত বন্যা যেমন বন্ধ করা যায়, তেমনি প্রায় সমস্ত বৎসর ধরিয়া উহাকে পূর্ববঙ্গের ন্যায় একটি স্রোতস্বতী নদীতে পরিণত করিয়া উহার উভয় পার্শ্বের অপেক্ষাকৃত উষর ক্ষেত্রকে সমস্ত বৎসর ব্যাপী কৃষিকার্যের জন্য উপযোগী করিতে পারা যায়। আমার মনে হয়, এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে আর বিলম্ব করা মোটেই উচিত নহে। এই বৎসর দামোদরের বন্যার ফলে কলিকাতা ও হুগলি জেলার বহুলাংশে ভবিষ্যৎ ক্ষতির যে সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্বে বাংলা গভর্মেণ্ট সমস্ত অঞ্চলটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। পূর্বোল্লিখিত জলাধার স্থাপন করিবার সপক্ষেই তাঁহারা বিশেষজ্ঞের অভিমত পাইয়াছিলেন।

বর্তমান যুদ্ধের পর এই ব্যাপারটি পুনরায় আলোচিত হইলে এই পরিকল্পনাকে প্রকৃতরূপে কার্যকরী করা অসম্ভব হইবে না।

এই দুইটি অঞ্চল ছাড়া বাংলার উত্তরপূর্ব সীমান্তেও জলাধার স্থাপন করা সম্ভব। আসামের গিরিগাত্র মধ্যে একাধিক উপযুক্ত স্থানে সুবৃহৎ জলাধার স্থাপন করা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন ব্রহ্মপুত্র নদের বেগবান স্রোতধারার সাহায্যেও বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব প্রান্তে যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎস্রোত উৎপাদিত হওয়া সম্ভব। আসাম গভর্মেণ্টের সহিত যুক্তভাবে কার্য চালাইলে কেবল হাইড্রো-ইলেকৃট্রিক নহে, আসাম কয়লার সাহায্যেও ঐ অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতে পারিবে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বাংলাদেশের অন্তত তিনটি দিক হইতে প্রচুর পরিমাণে নূতন এবং প্রচণ্ড শক্তিশালী বিদ্যুৎস্রোত উৎপাদিত হইতে পারে।

বাংলা মাতার পাদদেশ ধৌত করিয়া যে সাগরবারি সর্বদাচঞ্চলা রহিয়াছে, ভবিষ্যতে তাহাকেও যে কার্যে নিয়োজিত করিতে না পারা যাইবে এমন নহে। পাশ্চাত্ত্য দেশে এইরূপ জোয়ার ও ভাটার চঞ্চল-গতিবেগকে ধরিয়া সাগর-স্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। এখানেও তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করি না, তবে এখনও উহা পরীক্ষাসাপেক্ষ। যদি এই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করা যায়, তাহা হইলে বাংলাদেশের চতুষ্পার্শ্ব হইতেই অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যুৎস্রোত উৎপাদিত হইতে পারিবে। এইরূপ সুবিধা বাংলাদেশে না থাকিয়া পাশ্চাত্ত্য যে কোন দেশে থাকিলে তাহারা নিশ্চয় ইহাকে বহু পূর্বেই কাজে লাগাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের অলস প্রকৃতি আজ পর্যন্ত আমাদিগকে এই সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুপ্রাণিত করে নাই। কিন্তু চিরকালই কি আমরা নিষ্ক্রিয় থাকিব ? উপযুক্ত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম সহযোগে আজিকার এই কল্পনাকে রূপ দিতে অধিক বেগ পাইতে হইবে না। ইহার জন্য প্রয়োজন উদ্যোগী পুরুষের ও সহানুভূতিশীল রাজশক্তির। আমার মনে হয়, এখন এমন সময় সমাগতপ্রায় যখন আমরা এই উভয়বিধ উপায়ই গ্রহণ করিতে পারিব। উপযুক্ত ব্যক্তির সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন রাজশক্তির যোগাযোগ সত্বর ঘটিবে।

অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, বাংলাদেশে শিল্পালয়পরিচালন জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তাহা আমরা সহজেই পাইতে পারিব। এখন দেখা যাউক এখানে শিল্পকার্যের উপযুক্ত কি কি কাঁচা মাল কত পরিমাণে পাওয়া যাইবে। এই কাঁচা মালকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। প্রথম, খনিজ পদার্থ যাহা স্বাভাবিক উপায়ে যথেষ্ট পরিমাণে মজুত থাকে। আর দ্বিতীয়ত, কৃষিজাত দ্রব্য, ইহাকে চেষ্টা দ্বারা উৎপাদন করিতে হয় ও তাহার পরিমাণ চেষ্টানুযায়ী অল্পাধিক হইতে পারে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর দ্রব্যরাজির পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব নহে। উহা যে পরিমাণে বর্তমান রহিয়াছে, তাহাই কাজের জন্য নিযুক্ত হইতে পারে।

শস্যশ্যামলা এই সুন্দর দেশটিতে খনিজ পদার্থ তেমন অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় না; তবু কয়লার ন্যায় মূল্যবান খনিজ বাংলাদেশের পশ্চিম প্রান্তে বিস্তৃত ক্ষেত্র পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে—সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই কয়লার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা পূর্বে বলিয়াছি, কিন্তু উহাই কয়লার একমাত্র ব্যবহার নহে। কয়লার সাহায্যে কতগুলি রাসায়নিক শিল্পালয় চালানো সম্ভব তাহার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কয়লা ব্যতীত অল্পাধিক পরিমাণে লৌহ খনিজও বাংলার প্রান্তদেশে এবং বর্তমান বিহার প্রদেশের উপকণ্ঠে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই লৌহ খনিজ হইতে নানা শ্রেণীর লৌহ প্রস্তুত হইয়া বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত হইতেছে। একটু যত্ন করিলে এই লৌহ প্রস্তুতের জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সাহায্যে আরও বহুবিধ ছোটবড় প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে পারে। ইহার পর চুনা পাথর ও জিপ্সামের কথা উল্লেখ করা যায়। এই পদার্থগুলি চুন ও সিমেণ্ট প্রভৃতি গৃহনির্মাণোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত জন্য যেমন প্রয়োজন হয়, তেমনি ইহার সাহায্যে আরও বহুবিধ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ফায়ারব্রিক বা তাপসহ ইষ্টক নির্মাণোপযোগী কাঁচা মালও বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে ও তাহার সাহায্যে ফায়ারব্রিক প্রস্তুত হইতেছে। ইহা ব্যতীত বকসাইট ও কাদা জাতীয় মাটি হইতে নানারূপ চিনামাটির পাত্রাদি প্রস্তুত হইয়া

থাকে। এই সমস্ত পদার্থ নিয়মিত ভাবে আহৃত হইয়া নানা কার্যে উন্নততর উপায়ে ব্যবহৃত হইতে পারে। দেশের দক্ষিণ অংশে যে সমুদ্রজল চির বর্তমান, তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপন্ন করিয়া বিশিষ্ট কর্মে উহাকে নিযুক্ত করা যায়—সে কথাও পরে বলিতেছি। খনিজ পদার্থের সম্বন্ধে আমাদের সচ্ছলতা অত্যন্ত অধিক না হইলেও আমাদের কৃষিজাত সম্পদকে ইচ্ছানুযায়ী বৃদ্ধি করা সম্ভব। আজ এই মুহূর্তে আপাতদৃষ্টিতে এ কথার সত্যতা প্রমাণ হয় না, কারণ দেশব্যাপী এই দারুণ খাদ্যাভাবের মধ্যে কে ভাবিবে যে বাংলাদেশ তাহার স্বকীয় আহার্য নিজ ক্ষেত্রে উৎপাদন করিতে সক্ষম। কিন্তু বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, বাংলার বহির্ভাগ হইতে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য পূর্বে এ দেশে আনীত হইত তাহার অভাবই বর্তমানের এই সুদূরপ্রসারী হাহাকারের প্রকৃত কারণ নহে, কারণ বাংলাদেশ হইতে রেঙ্গুনের পতনের পূর্বে যে পরিমাণ চাউল পাশ্চাত্য দেশাভিমুখে প্রেরিত হইত, ভারতের বহির্ভাগ হইতে আনীত চাউলের পরিমাণ তাহা অপেক্ষা তেমন অধিক ছিল না। এই হাহাকারের মূলে রহিয়াছে কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তির অদূরদর্শিতা, ও তৎসহ মিলিত হইয়াছে—তাহাদিগের সততার অভাব। যে চক্রান্তের ফলে বর্তমানের এই দুরবস্থার আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহা সর্বকালে সংঘটিত হইতে পারিত না। বিচক্ষণ ব্যক্তি দ্বারা দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হইলে, এইরূপ অবস্থার আবির্ভাব পুনরায় ঘটিবে না, ইহা অতি সত্য কথা। কাজেই দেশের কৃষিজাত পণ্য যথেষ্ট বর্ধিত করা যে সম্ভব, সে কথা সহজেই অনুমেয়। কৃষিজাত কোন্ কোন্ পদার্থ কি ভাবে শিল্পে নিযুক্ত হইতে পারে এবং কিরূপেই বা কৃষির উন্নতি ঘটানো সম্ভব, ইহাও আর একটি প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইল।

বাংলার খনিজ সম্ভার

বাংলার খনিজ সম্ভার বলিতে গেলে সর্বপ্রথম পাথুরিয়া কয়লার কথাই মনে হয়। কলিকাতা হইতে ১২০ মাইল পশ্চিমে রানীগঞ্জে কয়লার খনি আরম্ভ হইয়াছে ও উহা প্রায় ৫০ মাইল পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দক্ষিণ-পূর্বের বিস্তৃতি প্রায় ২০ মাইল। এই কয়লার ক্ষেত্র প্রকৃতপক্ষে সুদূরবিস্তৃত দামোদর উপত্যকার একাংশ মাত্র। দামোদর উপত্যকার কয়লাক্ষেত্র পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশের শিংরওলি পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছে এবং টাটাপানি হইতে এই কয়লাস্তর দক্ষিণে ঘুরিয়া রায়গড় ও হিদীরের রায়পুরক্ষেত্র পর্যন্ত গিয়াছে। তথা হইতে প্রায় এক শত মাইল পূর্ব-দক্ষিণ হইয়া উড়িষ্যার তালচের রাজ্যের কয়লা খনির মধ্যে পর্যবসিত হইয়াছে। বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে ব্রাহ্মণী নদীর উত্তর তীরে রাজমহল পাহাড় অবস্থিত। ঐ পাহাড়ের নিম্নেও প্রায় ৭০ বর্গ মাইল ব্যাপী হুরা, চালার, ভিটা, পাঁচওয়ারা, মহুয়াগা ও ব্রাহ্মণী এই পাঁচটি কয়লাক্ষেত্র বর্তমান। এই স্থানে লুক্কায়িত কয়লার পরিমাণ ২১ কোটি টন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই খনি হইতে অধিক পরিমাণে কয়লা উত্তোলিত হয় নাই, তবে স্থানীয় প্রয়োজনানুসারে অল্প পরিমাণ কয়লা তোলা হয়। অবশ্য এই কয়লা উৎকৃষ্টশ্রেণীর নহে।

রানীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে উৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যায়। ইহার স্তর প্রায় চার ফিট হইতে দুই হাজার ফিট পর্যন্ত গভীর। এই কয়লার পূর্ণ পরিমাণ ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ৬ হাজার কোটি টন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মাঝারি কাজ-চালানো কয়লা, যাহার ছাইয়ের অংশ প্রায় শতকরা ২০ ভাগ, তাহার পরিমাণ ২০০০ কোটি টন এবং উৎকৃষ্টতর কয়লা, যাহার ছাইয়ের অংশ শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ, তাহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০০ কোটি টন। এই পরিমাণ কয়লা নিম্নোদ্ধৃত তালিকানুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে প্রাপ্তব্য।—

কাজ-চালানো কয়লা

গিরিডি ও জয়ন্তী	৮	কোটি	টন
দার্জিলিং পর্বতের নিম্নদেশে	২	"	"
রানীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো ইত্যাদি স্থানে	১০১৫	"	"
শোণ, ছটোর ও সোহাগপুর উপত্যকায়	২০০	"	"
ছত্রিশগড় ও মহানদী (তালচের)	১২০	"	"
সাতপুরা প্রদেশ	১৫	"	"
ওয়ার্ধা গোদাবরী	৬৪০	"	"

উৎকৃষ্টতর কয়লা

গিরিডি জয়ন্তী	৪	কোটি	টন
রানীগঞ্জ	১৮০	"	"
ঝরিয়া	১২৫	"	"
বোকারো	৮০	"	"
করমপুরা	৭৫	"	"
ছটার, জোতিলা, বুড়ার (সাহারনপুর)	৫	"	"
কুরাসিং৷ ঝিলমিল	৩	"	"
তালচের	২০	"	"
মোহপানি, কন্থান	৩	"	"
বল্লালপুর	৫	"	"

ভারতবর্ষের মধ্যে রানীগঞ্জের কয়লা খনিই সর্বপ্রথম লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রানীগঞ্জের কয়লাই বেশী পরিমাণে চলিতেছিল। ইহার পরই ঝরিয়ার কয়লা খনি হইতে কয়লা উঠিতে থাকে। রানীগঞ্জ হইতে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ৬৪,১৯,০০৭ টন হইয়াছিল। ঐ স্থানে মনে হয় ৩৪০০ ফিট গভীরতা পর্যন্ত কয়লার স্তর বর্তমান। এই কয়লার শ্রেণীবিভাগ করিতে গেলে দেখা যায় যে এখানকার উৎকৃষ্ট কয়লার (বরাকর যুগের) জলীয় ভাগের পরিমাণ শতকরা ১ হইতে ৩·৫ ভাগ

পর্যন্ত। Volatile বা উদ্বায়ী অংশ ২১ হইতে ৩০ ভাগ এবং প্রকৃত অঙ্গার ভাগ শতকরা ৫২ হইতে ৬৪ ভাগ; ইহাই উৎকৃষ্ট স্টীম কোলের অন্তর্গত। উহা হইতে বেশ কঠিন কোক কয়লা পাওয়া যায়। রানীগঞ্জ বা অপেক্ষাকৃত উপর স্তরের কয়লায় শতকরা ৩ হইতে ১০ ভাগ জলীয় অংশ, ২৯ হইতে ৩৮ ভাগ volatile বা উদ্বায়ী অংশ বর্তমান। ইহা হইতে কোক কয়লা ভাল হয় না, কিন্তু ইহা উৎকৃষ্ট গ্যাস কোল। বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লা রানীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পরিমাণে বর্তমান রহিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

	১০০০ হাজার ফুট গভীরতা পর্যন্ত	২০০০ হাজার ফুট গভীরতা পর্যন্ত
কোকিং কোল বা উৎকৃষ্ট কোক প্রদায়ী কয়লা	৮,১৭,৯১,০০০ টন	২৪,১৯,০৫,০০০ টন
নন-কোকিং বা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গ্যাস কয়লা	৯৬,৩৬,৪৪,০০০ টন	১৫৭,০৭,৩০,০০০ টন
নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা	৪৬৩,১১,৪২,০০০ টন	৬৮৫,৯২,৯১,০০২ টন

১৯০০ হইতে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রানীগঞ্জ-ক্ষেত্র হইতে ১,৮৪,১৫,০০৯ টন কয়লা ভারতবর্ষের বাহিরে রপ্তানি হয়। ইহার মধ্যে সিংহল দ্বীপ লইয়াছিল শতকরা ৫৮·২ স্ট্রেট্‌স্ সেট্‌লমেণ্ট ১৯·২, সুমাত্রা ৬·১, হংকং ৪·৯, এডেন ৪·৮ ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ১·৩ অংশ। অথচ ঐ সময়ের মধ্যে ১,০১,৬১,৭৪১ টন কয়লা ভারতবর্ষের মধ্যে আমদানি হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বিভিন্ন দেশ হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ আসে:

ইংলণ্ড	শতকরা	৪৫·৬ অংশ
দক্ষিণ আফ্রিকা	”	৩৪·৬ ”
অস্ট্রেলিয়া	”	৭·৮ ”
জাপান	”	৬·১ ”
অন্যান্য দেশ হইতে	”	৫·৯ ”

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের পরে আরও অধিকতর পরিমাণে এদেশীয় কয়লা খাদ হইতে উত্তোলিত হইতে থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমাদের খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লার পরিমাণ বড় অল্প নহে। ঠিকমত ব্যবহার হইলে ইহার দ্বারা বহুদিন পর্যন্ত আমরা নানাবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান চালাইতে পারিব।

অন্যান্য খনিজ মধ্যে লৌহের খনিজের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। অল্পাধিক পরিমাণে এই পদার্থটি বীরভূম ও বর্ধমান জেলার অংশ বিশেষে বর্তমান। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে লৌহ প্রস্তুত জন্য বীরভূম ও বর্ধমানের বিভিন্ন স্থানে কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্বতন প্রতিষ্ঠান অকৃতকার্য হইলে, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই রানীগঞ্জ কয়লা-খনির আশেপাশে কয়েকটি লৌহের কারখানা স্থাপিত হয়। বার্নপুর, কুলটি ও বরাকরের কারখানাগুলি বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই বুঝিতে হইবে যে, এই অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণ লৌহের খনিজ বর্তমান রহিয়াছে। উপযুক্ত চেষ্টা দ্বারা এই খনিজ আহৃত হইলে লৌহ কারখানা বঙ্গদেশের পশ্চিমপ্রান্তে বেশ ভালরূপেই চলিতে পারে। এই অঞ্চলে আরও সুবিধা এই যে, বিহারের বিভিন্ন স্থান হইতে সহজে ও অল্প খরচায় বহু পরিমাণে এই সকল খনিজ নীত হইতে পারিবে। অতএব এই প্রদেশের লৌহখনিজের প্রাচুর্য না থাকিলেও শীঘ্র অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

ইহা ব্যতীত রানীগঞ্জে যে বিশেষ শ্রেণীর মাটি পাওয়া যায় তাহা হইতে নানাবিধ গৃহনির্মাণোপযোগী প্রয়োজনীয় পদার্থ নির্মিত হইতে পারে। এই স্থানের উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিমে বিহারের যে সকল স্থান অবস্থিত সেখানে নানাবিধ খনিজ উপকরণ পাওয়া সম্ভব। এই সকল পদার্থ সহযোগে বর্তমানে বহুবিধ কাজের জিনিস প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল পদার্থের মধ্যে চিনামাটির আধারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চিনামাটি ও ঐরূপ অন্য মাটির সাহায্যে অনেক রকম শিল্পালয় গঠিত হওয়া সম্ভব। যদিও এই সকল পদার্থের পরিমাণ প্রভূত নহে, তথাপি পার্শ্ববর্তী প্রদেশ হইতে যাহা পাওয়া যাইবে তাহাতে

বহুকাল পর্যন্ত আমাদিগকে শিল্পালয় পরিচালনে সাহায্য করিবে, সে কথা সহজেই অনুমেয়।

বিভিন্ন খনিজ মধ্যে এ দেশে কয়লার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। এই কয়লার সাধারণ ব্যবহারের কথা সকলেরই অল্পাধিক জানা আছে। উহাকে খনি হইতে তুলিয়া রপ্তানি করিতে পারিলেও যথেষ্ট লাভ; কিন্তু তাহার চাইতেও ইহার অন্যান্য উন্নততর ব্যবহার রহিয়াছে সেই কথাই এইবার আলোচনা করিব।

বাংলার খনিজের যথোপযুক্ত ব্যবহার

ক (কয়লা)

কয়লা একটি বিশিষ্ট ইন্ধন। বর্তমানে বাংলাদেশে বহু বাড়িতেই কয়লার আগুনে উনান জ্বলে। কিন্তু উনানে জ্বালাইবার জন্য কোকই অধিকতর উপযোগী। কোক ও কোলের মধ্যে পার্থক্য এই যে, খনি হইতে প্রাপ্ত কাঁচা কয়লাই কোল নামে পরিচিত। এই কয়লা পোড়াইয়া যখন ধোঁয়া ইত্যাদি উঠা বন্ধ হইয়া যায় তখন যাহা পড়িয়া থাকে, তাহা লইয়া আগুন জ্বালাইলে আর ধোঁয়া বাহির হয় না। এই কয়লাই কোক নামে পরিচিত। কোল হইতে কোক-প্রস্তুতকার্য যেমন বাহিরে রাখিয়া আগুন লাগাইয়া সম্পাদিত হয়, তেমনি রুদ্ধ পাত্রে কোলকে তাপ দিলেও যথেষ্ট পরিমাণ গ্যাসীয় অংশ ও আলকাতরার ন্যায় একপ্রকার তরল পদার্থ নির্গত হইয়া যায়। যাহা ঐ পাত্রে পড়িয়া থাকে তাহাই কোক নামে পরিচিত। এই প্রক্রিয়াই কোকিং প্রথা। অল্প পরিমাণে কোক প্রস্তুত করিবার সময় বাহিরে খোলা জায়গায় উত্তাপ দিয়া যে গ্যাসীয় পদার্থকে পুড়াইয়া ফেলা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে অতি মূল্যবান সামগ্রী। এইজন্য উহাকে ঐরূপে নষ্ট না করিয়া রুদ্ধ পাত্রে উত্তাপ দিয়া উহা আহরণ করা কর্তব্য। এই কোকিং-কার্যের জন্য যে কারখানা স্থাপিত হইতে পারে, তাহা নিশ্চয়ই লাভজনক ব্যবসায়ে

পরিণত হইবে। এইরূপ কারখানা হইতে কি কি পাওয়া যায় এইবার সেই কথা বলিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে আমরা সাধারণভাবে কোক-কয়লা প্রস্তুত করিতে গিয়া যে নিদারুণ ক্ষতির সৃষ্টি করি, তাহা প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সম্পদের বিনাশ সাধন করার সমকক্ষ। এইরূপ ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে আমাদিগকে সর্বদা সাবধান থাকিতে হইবে।

কয়লা যখন খনি হইতে উঠানো হয়, তখন ইহার একাংশ চূর্ণ হইয়া যায়। এই চূর্ণ কয়লার ব্যবহার বিশেষ কিছু দেখা যায় না। ইহাও জাতীয় সম্পদের অপচয়। এই অপচয় নিবারণ করিতে হইলে চূর্ণ কয়লাকেও কাজে লাগাইতে হইবে। ষ্টীম-বয়লার অথবা ষ্টীম-এঞ্জিন চালনায় কাঁচা কয়লা দাহ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ঐরূপ কার্যে এই চূর্ণ কয়লা ব্যবহার করা প্রয়োজন। অবশ্য ইহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করা সহজ ব্যাপার নহে, এইজন্য যতদূর সম্ভব ইহাকে স্থানীয় কার্যে ব্যবহার করিতে হইবে। একটু চেষ্টা করিলেই ইহাকে কতকগুলি শ্রেণী বা gradeএ ভাগ করা সম্ভব। উহাদিগের মধ্যে যেগুলি সোজা দাহ্য-হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না, তাহাকে যন্ত্র সাহায্যে কয়লার ইষ্টকে পরিণত করা সম্ভব। জার্মানিতে নিম্নস্তরের কয়লা এইরূপে ইষ্টকে পরিণত হইয়া সহজে স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। অতএব এ দেশেও ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। যদি স্থানীয় ব্যবহারে ঐ কয়লাকে নিযুক্ত করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সমস্ত চূর্ণ কয়লাই ইষ্টকে পরিণত হইয়া স্থানান্তরিত হইতে পারিবে। এই ইষ্টক-প্রস্তুতকার্যে চাপ-প্রদানের যন্ত্র প্রয়োজন। চাপ-যন্ত্রে ফেলিয়া ইচ্ছানুযায়ী আকারের ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা সহজসাধ্য। চূর্ণ কয়লা ইষ্টকে পরিণত হইলে যেমন উহা দেখিতে সুদৃশ্য হইবে, তেমনই স্থানান্তরীকরণের জন্য উপযুক্ততর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কোক, লৌহ-প্রস্তুতকার্যে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয়। গৃহস্থালির কার্যে ইহার সাধারণ ব্যবহারও বহুদূরপ্রসারী। অতএব কোকের জন্য বাছিয়া উত্তম শ্রেণীর কয়লা লইতে হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেশের কোকিং কয়লার মধ্যে শতকরা ৫৫ ভাগ কোক বা

অঙ্গারের সহিত প্রায় ৩০ ভাগ volatile বা উদ্বায়ী পদার্থ বর্তমান। এই কোকিং-ক্রিয়ার সময় উদ্বায়ী অংশ উড়িয়া কয়লা হইতে নির্গত হইয়া যায়। তখন উপযুক্ত জমানো-যন্ত্রের সহযোগিতায় উহার একাংশকে তরল পদার্থে পরিণত করা যায়। কিন্তু অন্য অংশ বায়বীয় অবস্থায় জমানো যন্ত্র হইতে নির্গত হইয়া যায়। এই উদ্বায়ী অংশ পরে অপেক্ষাকৃত অধিকতর শীতল হইলে উহা হইতে একটি তরল তৈলজাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। তখনও যে অংশ বায়বীয় অবস্থায় থাকে তাহাকে জল বা জলীয় সালফিউরিক অ্যাসিড সহযোগে ধৌত করিলে উহার একাংশ নির্গত হইয়া যায়। উহাই অ্যামোনিয়া নামে পরিচিত। সালফিউরিক অ্যাসিড সহযোগে উহা অ্যামোনিয়াম সালফেট নামীয় একটি দানাদার লবণজাতীয় দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু অন্য উদ্বায়ী অংশে তখনও অন্য জিনিস মজুত থাকে। এই উদ্বায়ী পদার্থ হইতে সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন, লৌহাম্লজ সহযোগে বাহির করিয়া লওয়া হয়। তারপর উহাকে দাহ্য গ্যাস হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এইরূপ গ্যাস শহরের রাস্তায় আলোকদান করে, অথবা গ্যাস-চুল্লীর মধ্যে উহা দ্বারা বহুগৃহে রন্ধনক্রিয়া সমাপিত হইয়া থাকে।

কয়লার উদ্বায়ী অংশ তরল আকার প্রাপ্ত হইলে কোলটার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই কোলটারকে কয়েকটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়। তাহার বিবরণ পরে দিতেছি। এই উদ্বায়ী অংশ বাদে কয়লার যে অংশ রুদ্ধ পাত্র মধ্যে পড়িয়া থাকে, তাহাই কোক। এই কোকের ব্যবহারও একাধিক উপায়ে ঘটিয়াছে। এখন দেখা যাউক, এই সকল পদার্থ উৎপাদন করিয়া বাংলাদেশের শিল্পশালায় কি উন্নতি বা পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব।

খনি-অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কয়লা উত্তোলন করিয়া সেখানে যদি কোকিং-ক্রিয়ার জন্য সরঞ্জাম জোটানো যায়, তাহা হইলে কয়লার একাংশ নির্গত হইয়া উপযুক্ততর কোকরূপ ইন্ধন প্রস্তুত হইলে বৃথা যে শতকরা ৩০ ভাগ পদার্থ বহন করিবার জন্য রেলভাড়া দিতে হইত, তাহা বাঁচিয়া যাইবে। কাজেই একই খরচায় অধিকতর পরিমাণে কোক পাওয়া

যাইবে। তদুপরি এই যে কয়লার শতকরা ৩০ অংশ যাহা উদ্বায়ী অংশরূপে বাহির হইয়া গেল তাহা বৃথা নষ্ট হইবে না। উহাও উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইবে। অতএব মনে হয় কোকের দরও যথেষ্ট পরিমাণে সস্তা হইবে। ফলে সস্তা কোক বাংলাদেশের সর্বাংশে বিক্রীত হইতে পারিবে।

এখন সমস্যা দাঁড়াইতেছে এই যে, যে পরিমাণ কোক বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন তাহা প্রস্তুত করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে গ্যাসীয় ইন্ধন ও কোলটারও উৎপাদিত হইবে। ঐ পদার্থগুলির উপযুক্ত মূল্য না পাইলে কোকের মূল্য কমিবে না। অর্থাৎ ঐ পদার্থগুলিকে যথোপযুক্ত কার্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। কাজেই পিট-হেড বা খনিমুখের নিকটে আরও কতকগুলি শিল্পালয়ের প্রতিষ্ঠা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ঐ সকল শিল্পালয়ে গ্যাসীয় ইন্ধন সহজপ্রাপ্য পদার্থ হিসাবে উত্তাপ প্রদানের কার্যে নিয়োজিত হইবে এবং ঐ সঙ্গে ইহার অন্য ব্যবহারও হইতে পারিবে।

এই গ্যাস ইন্ধন প্রকৃতপক্ষে মিথেন নামীয় বাষ্পপূর্ণ ; অন্য গ্যাসও অল্প পরিমাণে উহাতে বর্তমান থাকে। এই গ্যাসটিকে গ্যাসোলিনে পরিণত করা যায় কি না, এই লইয়া পরীক্ষা চলিয়াছে। এই চেষ্টা সফল হইলে প্রচুর পরিমাণে তরল ইন্ধন এই গ্যাস ইন্ধন সহযোগে প্রস্তুত হইতে পারিবে। যতদিন তাহা সম্ভব না হয়, ততদিন ইহাকে তাপ-প্রদান-কার্যে নিযুক্ত করাই শ্রেয়।

কয়লার গ্যাসের সহিত যে অ্যামোনিয়া নির্গত হয়, তাহা হইতে অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রস্তুত করা যায়। এই অ্যামোনিয়াম সালফেট নানা কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে। অ্যামোনিয়াম সালফেট জমির জন্য পরম উপাদেয় সার। উহার সাহায্যে কৃষির উন্নতি করা সম্ভব। সহজে ও সস্তায় উহা পাওয়া গেলে উহাকে প্রচুর পরিমাণে জমির উৎকর্ষ-সাধনকার্যে নিযুক্ত করা যায়।

কোক সাধারণত ধাতব খনিজ হইতে ধাতু-উদ্ধারকল্পে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশেই বর্তমানে উহার সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে লৌহ ও নানাবিধ

ইস্পাত প্রস্তুত হইতেছে। তবে এখনও আমরা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর ইস্পাতের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছি। এ দেশে লৌহ-শিল্পের অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার সুযোগ রহিয়াছে। নানাবিধ যন্ত্রাদি নির্মাণকার্যে বিবিধ প্রকার লৌহ প্রয়োজন। যন্ত্রাদির চাহিদা বাড়িলে উহা দেশেই প্রস্তুত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান সময়ে যখন আমরা এই জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের ফলে বহির্দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, তখনই দেশের মধ্যে যন্ত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে সচেতন হইয়াছি। যাহাতে এরূপ দুর্দিনের পুনরভিনয় না হয়, তাহার চেষ্টা সর্বতোভাবে করা প্রয়োজন। অবশ্য আমরা নিরুপায় হইলে অন্য কথা ছিল, কিন্তু উপায় থাকিতে চেষ্টা না করা অত্যন্ত পরিতাপের কথা। বিভিন্ন শ্রেণীর লৌহ প্রস্তুত করিতে পারিলে নানাবিধ কার্যে উহার নিয়োগ হইতে পারিবে। বর্তমানে এদেশে ইস্পাতের প্রস্তুত অতি সাধারণ দ্রব্য যেমন স্ক্রু, ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, ক্ষুরব্লেড প্রভৃতি নানা পদার্থের অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে। ছুতারমিস্ত্রির যন্ত্রই হউক বা কর্মকারের যন্ত্রই হউক কোন যন্ত্রই এখন পাওয়া সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি কৃষিক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির মধ্যে একটু উন্নত শ্রেণীর যন্ত্রাদি কিছুই পাওয়া যায় না। সাধারণ যন্ত্র সম্বন্ধে যখন এই কথা, তখন বিশিষ্ট যন্ত্রের কথা সহজেই অনুমেয়। সুখের বিষয় ক্রমে ক্রমে নানা যন্ত্র নির্মাণের চেষ্টা এ দেশে ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। তবে একটি জাতীয় পরিকল্পনা লইয়া কোথায় কোন্ জিনিসটি সহজে প্রস্তুত হইতে পারে স্থির করিয়া দিলে এই সকল প্রচেষ্টা ভবিষ্যতের জন্যও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে। ইস্পাতের বিভিন্ন ব্যবহারের কথা পরে একটু বিশদভাবে আলোচিত হইল।

লৌহ ব্যতীত তামাও অল্প পরিমাণে এখানে প্রস্তুত করা সম্ভব। ঘাটশিলায় তাম্রখনি হইতে যে তামা উদ্ধার করা হইতেছে, তাহাই একটু সাবধানে প্রস্তুত করিতে পারিলে আরও একটি প্রয়োজনীয় পদার্থ উহা হইতে পাওয়া যাইত। এই ঘাটশিলার তাম্রখনি হইতে যে তাম্রখনিজ পাওয়া যায়, গন্ধক তাহার অন্যতম উপাদান। ইহাকে বর্তমানে

সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করা হইতেছে। অথচ একটু চেষ্টা করিলেই, বিশেষত বৈদ্যুতিক শক্তি সস্তায় পাওয়া গেলে, নির্মল তাম্র যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারে। নির্মল তাম্র পাইলে বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্মাণকার্য ও বিদ্যুৎ বহন জন্য তামার তার বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইবে। এখন আমাদিগকে এই পদার্থটির জন্যও বহির্দেশের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইয়াছে।

এই সকল কার্য ভিন্ন কোক সাহায্যে চুনাপাথর হইতে ক্যালসিয়াম কারবাইড প্রস্তুত হইতে পারে। ক্যালসিয়াম কারবাইড বর্তমানকালে একটি প্রয়োজনীয় পদার্থ। কারবাইড হইতে অ্যাসেটিলিন গ্যাস পাওয়া যায়, তাহার কথা অনেকেই জানেন। কারবাইড এ দেশে প্রস্তুত হয় না বলিয়া উহার দাম বর্তমানে অত্যধিক। পূর্বে যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা বলিয়াছি, তাহা সম্ভবপর হইলে অতি অল্পমূল্যে বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাইবে। তখন কারবাইড এখানেই প্রস্তুত হইতে পারিবে। পশ্চিম-বাংলা এই পদার্থটি প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রেষ্ঠতম স্থান, কারণ তথায় চুনাপাথর অতি সহজেই নীত হইতে পারিবে। অ্যাসেটিলিন যেমন আলোক প্রদান করে তেমনই ইহার সাহায্যে লোহা জুড়িবার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। অক্সিজেন সহযোগে অ্যাসেটিলিন পুড়িলে তখন সেই শিখার তাপমাত্রা অত্যধিক হইয়া থাকে। লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, এই তাপমাত্রা প্রায় ২৫০০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উঠে। কাজেই এই তাপে লোহা গলাইয়া ভাঙা টুকরা জোড়া দেওয়া সহজ হয়। ইহাই ওয়েল্‌ডিং নামে পরিচিত। ইহা ব্যতীত বর্তমান যুগে অ্যাসেটিলিন বাষ্প হইতে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসেটিক অ্যাসিড প্রস্তুত হইতেছে। এই অ্যাসিড নানারূপে বর্তমান সভ্যতার প্রসারে সাহায্য করিয়াছে। পূর্বে এই পদার্থ কাষ্ঠের Destructive distillation বা বিধ্বংসী চোলাই দ্বারা উৎপন্ন পদার্থ হইতে প্রস্তুত হইত। কিন্তু সব দেশে কাঠ বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় না। বিশেষত বাংলাদেশে এমন জঙ্গল নাই যে কাঠ সহজলভ্য হইবে, অথচ কোক এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সম্ভব। এই কোকের সাহায্যেই পরিশেষে আমরা অ্যাসেটিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিতে পারিব। অ্যাসেটিক অ্যাসিড সহযোগে কাঠের মণ্ড বা নিকৃষ্ট

শ্রেণীর তুলাকে কৃত্রিম রেশমে পরিবর্তিত করা হয়। কাজেই আমরা এদেশে কৃত্রিম রেশমের কারখানা অতি সহজেই স্থাপন করিতে পারিব। তুলা কৃষিজাত পদার্থ, উহার চাষ বাংলাদেশে খুব বেশী হয় না, অথচ উহার চাষ করা মোটেই কঠিন নয়। তুলা না হইলেও এ দেশে অন্য আকারে যে সেলিউলোয পাওয়া যায় তাহাকেও পরিবর্তিত করা সম্ভব। বিবিধ সেলিউলোযের কথা কৃষির উৎকর্ষ আলোচনায় উল্লিখিত হইবে। ইহার ব্যবহার দ্বারা যে রেশম-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার কথাও অন্যত্র আলোচিত হইল।

কোক হইতে আরও দুইটি প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে। কোক পুড়াইয়া প্রডিউসার গ্যাস উৎপাদিত হয়। ইহা প্রধানত অঙ্গারাম্লজ। এই গ্যাসই বর্তমানে অটোমবিল বা মোটরগাড়ি চালানোর কাজে পেট্রলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতেছে। কোক ও স্টীম সহযোগে ওয়াটার গ্যাস পাওয়া যায়। এই উভয়বিধ গ্যাসই অধুনা ব্যাপকভাবে রাসায়নিক শিল্পাগারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ওয়াটার গ্যাস প্রকৃতপক্ষে অঙ্গারাম্লজ বা Carbon monoxide ও হাইড্রোজেন এই দুইটি বাষ্পের মিশ্রণ।

উহা হইতে, অথবা প্রডিউসার গ্যাসের সহিত অন্য উপায়ে প্রস্তুত-কৃত হাইড্রোজেন মিশ্রিত করিয়া স্পর্শক্রিয় পদার্থ সহযোগে উহাকে মিথানলে পরিবর্তিত করা হয়। এই মিথানল সাহায্যে পেট্রল জাতীয় তরল ইন্ধন প্রস্তুত হইতে পারে অথবা উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে ফরমাল ডি-হাইড বা ফরম্যালিন পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত পদার্থটি প্লাষ্টিক শিল্পে যেমন ব্যবহৃত হইতেছে তেমনি ইহাকে ডিসিনফেকট্যাণ্ট বা বীজঘ্ন হিসাবেও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। মিথানল কিন্তু এরোপ্লেনের তরল ইন্ধন প্রস্তুতকল্পে ইতিপূর্বেই জার্মানিতে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

পূর্বোল্লিখিত কোলটারও কম প্রয়োজনীয় পদার্থ নহে। কিন্তু প্রথম যখন এই কোলটার কয়লা হইতে প্রস্তুত হইল, তখন কেহই উহার কোন ব্যবহার জানিত না। জিনিসটি দেখিতে যেমন কুৎসিত উহার গন্ধও

তেমনি অপ্রীতিকর। কাজেই উহাকে তখন ফেলিয়া দিতে হইত। ক্রমে অবস্থা অত্যন্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল। এই কোলটার নদীপথে কাস্পিয়ান সাগরে পতিত হইয়া উহার মৎস্যাদি বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। তখন বাধ্য হইয়া এই পদার্থকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা চলিল। আজ এই পদার্থটির সামান্যতম অংশও নষ্ট হয় না। পরন্তু ইহার প্রত্যেকটি উপাদান বহুবিধ কাজে নিযুক্ত হইতেছে। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

কোলটারকে প্রথমত তিনটি অংশে ভাগ করা হয়। উহাতে উত্তাপ দিলে সর্বপ্রথম যে বাষ্পীয় অংশ উত্থিত হয় তাহা জমাইলে লাইট অয়েল পাওয়া যায়, তারপর উহা হইতে মধ্যম তৈল বা middle oil প্রাপ্ত হওয়া যায় ও সর্বশেষে আসে হেভি অয়েল। এই অংশ আসিবার পর যাহা পড়িয়া থাকে তাহা অতি কুৎসিত আলকাতরা। তাহাও এখন আর নষ্ট হয় না, রাস্তা-নির্মাণকার্যে তাহা প্রযুক্ত হইতেছে।

লাইট অয়েল হইতে বেনযিন, টলুইন, যাইলীন প্রভৃতি নানাবিধ হাইড্রোকার্বন পাওয়া যায়। এই পদার্থগুলি যেমন রং তৈয়ারির জন্য প্রয়োজনীয়, তেমনি বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুতে ব্যবহার্য। আবার নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুতের জন্যও ইহাদিগকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। ইহা ব্যতীত কার্বলিক অ্যাসিড নামক পদার্থটি এই বেনযিন হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যাইলিন সহযোগে কৃত্রিম মৃগনাভি প্রস্তুত হইতেছে। টলুইন বিস্ফোরক প্রস্তুতের জন্য আজকাল অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সুপ্রসিদ্ধ টি. এন. টি. এই টলুইন হইতেই পাওয়া যায়। আবার এই টলুইনের সাহায্যে স্যাকারিন নামক অতি মিষ্ট পদার্থ টি প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্যাকারিন চিনির তুলনায় ৫০০ গুণ অধিক মিষ্ট। অর্থাৎ ৬¼ সের চিনির সাহায্যে যতখানি জলকে শরবতে পরিণত করা যায়, সেই পরিমাণ জল মাত্র ১ তোলা স্যাকারিনে ঐ শরবতের ন্যায় সুমিষ্ট হইবে। বহুমূত্ররোগীকে চিনি খাইতে দিলে তাহার রোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সেখানে কোনরকম অনিষ্টের আশঙ্কা না করিয়া স্যাকারিন ব্যবহার করা হয়। যাইলিন হইতে গত মহাযুদ্ধে

কাঁদুনে গ্যাস তৈয়ারি হইয়াছে। বেনযিন হইতে কার্বলিক অ্যাসিড ভিন্ন আরও বহুবিধ পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাদের কেহবা গন্ধের জন্য বিখ্যাত, কেহবা রঙের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। জার্মানির জৈব রংশিল্পে এই পদার্থটির প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক বলিয়া ইহার প্রচুর ব্যবহার সেখানে হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল বিশিষ্ট ব্যবহার ছাড়াও ইহাকে অটোমবিলের জন্য তরল ইন্ধন প্রস্তুতকল্পেও ব্যবহার করা হয়। ফ্রান্সে পাওয়ার অ্যালকোহলের সহিত ইহাকে বহুল পরিমাণে মোটরস্পিরিট-প্রস্তুতকার্যে নিযুক্ত করা হইত।

কোলটার হইতে মধ্যম তৈল ও ভারী তৈল বলিয়া যে অংশ পাওয়া যায় তাহা হইতেও নানাবিধ কাচের জিনিস প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল পদার্থের মধ্যে কারবলিক অ্যাসিড, ক্রেসল ও ন্যাফথালিনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কার্বলিক অ্যাসিড নানাবিধ ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হয়। কারবলিক সাবান সকলেরই সুপরিচিত পদার্থ। ইহার বীজাণুবিনাশী শক্তির জন্য ইহাকে বহুল পরিমাণে জলীয় দ্রবণে অথবা সাবানের সহিত ব্যবহার করা হয়। পরিষ্কৃত হইবার পূর্বেও ইহাকে ফেনাইল প্রস্তুত কার্যে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। আবার পিকরিক অ্যাসিডের ন্যায় বিস্ফোরক পদার্থ নির্মাণেও ইহারই প্রয়োজন ঘটে। পিকরিক অ্যাসিড অবশ্য পোড়া ঘায়ের জন্যও বিশেষ উপকারী পদার্থ। ন্যাফথলিন বিষকর্পূর নামে অনেকের নিকট পরিচিত। এই পদার্থটিও কীটনাশক; এই কার্যে উহাকে নিযুক্ত করা হয়। রংশিল্পে ইহার বহুল ব্যবহার ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষে পূর্বে নীলের চাষ ব্যাপকভাবে হইত। আজকাল এই নীলবড়ি আর এখানে প্রস্তুত হয় না। পরন্তু জার্মানির রসায়নাগার জগৎকে এই পরম প্রয়োজনীয় রংটি সরবরাহ করিতেছে। জার্মান রাসায়নিক ন্যাফথালিনকেই এই পদার্থ প্রস্তুতকল্পে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ন্যাফথালিন হইতে থ্যালিক অ্যাসিড প্রস্তুত হইয়া থাকে। অধুনা বায়ু হইতে অক্সিজেন লইয়া স্পর্শক্রিয় পদার্থ সাহায্যে ন্যাফথালিনকে থ্যালিক অ্যাসিডে পরিণত করা হয়। এই শেষোক্ত পদার্থটি ব্যাপকভাবে বর্তমানে বিশিষ্ট শ্রেণীর প্লাষ্টিক প্রস্তুতকার্যে নিযুক্ত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত কার্বলিক অ্যাসিড হইতেও এক শ্রেণীর প্লাষ্টিক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ সকল কথা পরে অন্য একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

বেনযিন ও ন্যাফথালিনকে স্পর্শক্রিয় নিকেলের সাহায্যে হাইড্রোজেনের সহিত যুক্ত করা সম্ভব। এইরূপে হাইড্রোজেন-যুক্ত হইলে উহাদের ব্যবহার অন্যরূপ হইয়া থাকে। তখন উহাদিগকে বহু পরিমাণে দ্রাবক হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ঐ সকল তরল দ্রাবকে বহুবিধ পদার্থ দ্রবীভূত হয় বলিয়া উহাদিগকে বিশিষ্ট কার্যে নিযুক্ত করা সম্ভব। ইহাদের ঐ সকল ব্যবহারের মধ্যে ল্যাকার বা স্প্রে পেণ্ট কার্যে নিয়োগের কথা উল্লেখ করা যায়।

জার্মানিতে লিগনাইট বা ব্রাউন কোল নামক একটি অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। এই কয়লার তেমন কোন চাহিদা ছিল না। তবে ইহাকেও ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করা হইত। কিন্তু অল্পকাল পূর্বে জার্মান রাসায়নিকদিগের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে এই অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লাকেও হাইড্রোজেন সাহায্যে তরল ইন্ধন প্রস্তুতকার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আজ চতুর্দিক হইতে পেট্রল সরবরাহ বন্ধ হইলেও জার্মানির যন্ত্রযান তেমনি চলিতেছে, যেমন যুদ্ধের পূর্বে চলিত। এই কার্যে তাহাদের কয়লা হইতে প্রাপ্ত তরল ইন্ধন যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। আমাদের দেশের কয়লাও আংশিকভাবে হাইড্রোজেন-যুক্ত হইতে পারে। ফলে আমরা বাংলাদেশেও কিয়ৎ পরিমাণে তরল ইন্ধন বা পেট্রল তৈয়ারি করিতে পারিব।

খ (চিনামাটি)

কয়লা ব্যতীত কিছু চিনামাটি পশ্চিম-বাংলার রানীগঞ্জ ক্ষেত্রে ও বিহার ও বাংলার সন্ধিস্থলে বেশ যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। এই চিনামাটিকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। শ্রেণী বিভাগে উহাকে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। ইতিপূর্বে এই মাটির সাহায্যে দুর্গাপুরে বার্ন কোম্পানি বিরাট টালির কারখানা প্রস্তুত করিয়াছেন। তথায় চিনামাটির পাইপ ও অন্যান্য স্যানিটারি ফিটিং তৈরি করা

হইতেছে। রাজমহলে যে চিনামাটি পাওয়া গিয়াছে, তাহার দ্বারা বেঙ্গল পটারি নানাবিধ চিনামাটির পাত্রাদি প্রস্তুত করিতেছে। আমার মনে হয়, একটু চেষ্টা করিলেই এই সকল চিনামাটির সাহায্যে বেশ বড় রকম পটারিব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ও তখন বাংলাদেশ ভারতবর্ষের অনেক অংশকেই চিনামাটির বাটি, প্লেট বা থালা, চা-পাত্র ও অন্যান্য বিবিধ পাত্রাদি সরবরাহ করিতে পারিবে।

যদিও বাংলাদেশের মধ্যে উত্তম শ্রেণীর বালু দেখা যায় না, তবু বাংলার অদূরবর্তী বহু স্থান হইতে সুন্দর পরিষ্কার বালু সংগৃহীত হইতেছে। কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে এই বালুকা-সাহায্যে ইতিমধ্যে অনেকগুলি কাচের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাচ বর্ত্তমান যুগের একটি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। ইহা প্রস্তুতের জন্য বিরাট কারখানার প্রয়োজন। এই কারখানা এখনও এখানে ঠিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এ দেশের প্রায় প্রত্যেকটি কারখানায় বহুবিধ কাচের পাত্র প্রস্তুত হইতেছে সত্য, কিন্তু আজও তাহাদের কোনটিই জার্মান, ইংলিশ বা মার্কিন কাচের সহিত এক-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে নাই। এমন কি জাপানী কাচও ইদানীং যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে আমাদের দেশীয় কাচ তাহারও সমকক্ষ হইতে পারে নাই। ফলে স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি একটি দেশব্যাপী বিতৃষ্ণার ভাব সুস্পষ্ট প্রকটিত হইয়া উঠে। দেশী কাচের উৎকর্ষ সাধন একান্তভাবে প্রয়োজন। আর আমার মনে হয়, এ বিষয়ে একটুখানি পরিশ্রম করিলেই তাহা করা যাইতে পারে। উন্নতশ্রেণীর কাচ হইতে যে পাত্রই প্রস্তুত করা যাউক না কেন তাহা দীর্ঘতরকাল ব্যবহৃত হইতে পারিবে। সহজে অল্প তাপ বা অল্প আঘাতে তাহা ভাঙিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

গ (লবণ)

এই সকল খনিজসম্ভার ব্যতীত আর একটি পরম প্রয়োজনীয় পদার্থ সমুদ্রবক্ষ হইতে আমরা সহজে পাইতে পারি। ইহা লবণ। লবণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অত্যাবশ্যক। ইহার প্রয়োজন কেবলমাত্র

আমাদের অন্নব্যঞ্জন ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। ইহাকে অন্যান্য উপায়ে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং আমি পূর্বে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সরবরাহের যে কথা বলিয়াছি, তাহাকে কার্যে পরিণত করিতে পারিলে এই লবণ সাহায্যেও অনেকগুলি নূতন শিল্পালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

সাধারণ লবণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপাদনের জন্য বিশিষ্ট উপকরণ। এই অ্যাসিড না হইলে বর্তমানের সভ্য সমাজের জীবনযাত্রা কঠিন হইয়া উঠিবে, কারণ আমাদের দৈনন্দিন বহু প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুতের জন্য ইহার বহুল ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে। এই লবণকে বিদ্যুৎস্রোত সাহায্যে দ্বিবিধ উপায়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। লবণের জলীয় দ্রবণের মধ্যে বিদ্যুৎস্রোত প্রবাহিত করিলে উহাকে দুইটি মূল পদার্থে বিশ্লিষ্ট করা যায়। উহাদের মধ্যে একটি অপরিবর্তিত অবস্থায় নির্গত হইতে থাকে, ইহাই ক্লোরিন ; কিন্তু অপরটি দ্রাবক জলের সহিত সংযুক্ত হইয়া কষ্টিক সোডা প্রস্তুত করে ও হাইড্রোজেন ত্যাগ করিয়া থাকে। এই হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন উভয় পদার্থই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহাদিগকে বহুবিধ কার্যে নিয়োজিত করা হয়। তন্মধ্যে ব্লিচিং পাউডার প্রস্তুতকার্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন একত্র সম্মিলিত হইলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস প্রস্তুত হয়। এই অ্যাসিড প্রস্তুত-কার্যেও ঐ বাষ্প দুইটির বহুল ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে। ব্লিচিং পাউডার যেমন কোরা বস্ত্র পরিষ্কারকার্যে নিযুক্ত হয়, তেমনি ইহা কাগজ-কারখানায় সার্জিক্যাল তুলা তৈয়ারির জন্য ও কৃত্রিম রেশম-শিল্পালয়ে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয়। ইহা ব্যতীত কে না জানে যে, এই ব্লিচিং পাউডার বীজাণুবিনাশী পদার্থ হিসাবেও অধুনা বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। পানীয় জল শোধনকার্যে ইহাকে বর্তমানে শহরে ও গ্রামে সর্বত্র ব্যবহার করা হয়। এই ব্লিচিং পাউডারে ক্লোরিনই বিশিষ্ট কার্যকরী পদার্থ। ক্লোরিন ও হাইড্রোজেন ব্যতীত লবণ হইতে কষ্টিক সোডা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য। উহার সাহায্যে তৈল বা চর্বি হইতে সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাবান-শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য তৈল বা চর্বি কৃষিজাত

পদার্থ হইতে পাওয়া যায়, কিন্তু ক্ষার পদার্থটি লবণ হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লবণ হইতে সালফিউরিক অ্যাসিড-যোগে যখন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুত হয়, তখন উহার সহিত অন্য যে পদার্থই উৎপন্ন হয় তাহাকে সাধারণত ক্ষারী লবণ কহে। এই লবণ কৃষিকার্যেও নিযুক্ত হয়। অথবা উহাকে কয়লার সহিত উত্তপ্ত করিয়া পরে চুনাপাথরের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় উত্তাপ দিলে তাহা হইতে সাধারণ ক্ষার বা সোডা পাওয়া যায়। এই সোডাও কাপড় কাচা কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া উহার আরও নানাবিধ রাসায়নিক প্রয়োগ রহিয়াছে। এই সোডাও লবণ হইতে পাওয়া যাইতে পারে। সোডা প্রস্তুত করিতে গিয়া আর একটি উপায়ে লবণ হইতে সোডি-বাই-কার্ব প্রথমে প্রস্তুত হয়। ঔষধে ইহার প্রয়োগ অনেকেই জানেন। এই উপায়ে সোডা প্রস্তুত করিতে হইলে অ্যামোনিয়ার প্রয়োজন হয়। অ্যামোনিয়া অবশ্য, পূর্বেই বলিয়াছি, কয়লা হইতে কোক প্রস্তুত করিবার সময় কিয়ৎ পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু জার্মান বৈজ্ঞানিক হাবের দেখাইয়াছেন যে, বিদ্যুৎশক্তির সহায়তায় বাতাসের নাইট্রোজেনকে পূর্বে বর্ণিত উপায়ে প্রস্তুত-কৃত হাইড্রোজেনের সহিত সম্মিলিত করিলেও অ্যামোনিয়া প্রস্তুত হয়। এ দেশে সস্তা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইলেই এই বৈদ্যুতিক প্রথায় বহুল পরিমাণে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত হইতে পারিবে। অ্যামোনিয়ার সাহায্যে জলকেও জমাইয়া বরফে পরিণত করা হয়। অবশ্য ঐ কার্যের জন্য অ্যামোনিয়াকে জলের সহিত মিশ্রিত হইতে দেওয়া হয় না। পরন্তু অ্যামোনিয়া গ্যাস তরলীভূত হইলে যে শৈত্যের সৃষ্টি হয় তাহাই জলকে শীতল করিয়া জমাইবার কাজে নিযুক্ত হইয়া থাকে।

লবণ হইতে আরও একটি পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে ইহা সোডিয়াম নামে পরিচিত। এই সোডিয়াম একটি ধাতুবিশেষ। কিন্তু লৌহ তাম্র স্বর্ণ বা রৌপ্যের ন্যায় ইহাকে অসাবধানে ব্যবহার করা যায় না। জলের সহিত ইহার সংযোগ ঘটিলে উহা জলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে। ঐ বিশ্লেষণকার্য এত দ্রুত অগ্রসর হয় যে, তৎকালীন উৎপন্ন তাপের সাহায্যে

বিশ্লিষ্ট বাষ্প হাইড্রোজেন সহসা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। এই পদার্থটি আগুন লাগাইবার পক্ষে অতি সহজ উপাদান। যাহা হউক, এই ধাতুটি কিন্তু বর্তমানে নানাবিধ কার্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ইহার বিভিন্ন রাসায়নিক প্রয়োগের কথা সহজে বুঝানো যাইবে না। তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই ধাতুর সাহায্যে কৃত্রিম রবার-শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সমুদ্রের লোনা জল হইতে লবণ ব্যতীত আরও কতকগুলি লাবণিক পদার্থ পাওয়া যায়। তাহাদের অনেকেই কাজের জিনিস। অতএব লবণ পৃথক করার পর যে লোনা জল বা বিটার্ন পড়িয়া থাকে, তাহাও কাজে লাগিতে পারে।

অনেকে হয়তো মনে করিবেন লবণ-প্রস্তুতকার্য বাংলাদেশে সহজসাধ্য নহে; অথবা উহা মিতব্যয়ী প্রথাও হইবে না। কিন্তু সে ধারণা যে ভুল, তাহা ইতিপূর্বে একটি বাঙালী লবণ-শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

ইস্পাতের কথা

লৌহের যখন প্রথম আবিষ্কার হয় তখন ইহাকে উল্কার দেহ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল। সকলেই এই নভোমণ্ডলের বিশিষ্ট বিচরণকারী উল্কার সঙ্গে পরিচিত। অন্তরীক্ষের যাবতীয় জ্যোতিষ্কের দেহই প্রায় একই রকম পদার্থে নির্মিত। উল্কাখণ্ডগুলি অধিকাংশই পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছাইবার পূর্বে ভস্মাবশেষে পরিণত হইলেও, উহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় বড় খণ্ড যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে, সে কথা অনেকেই জানেন। এইরূপ উল্কার দেহ প্রকৃতপক্ষে লৌহ নিকেল প্রভৃতি ধাতুর দ্বারা নির্মিত;—কোন কোনটিতে ধাতব লৌহের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ পর্যন্তও দেখা গিয়াছে। এইরূপ লৌহ নিকেল-ধাতুর সহিত মিশ্রিত থাকায় যে ইস্পাতসদৃশ পদার্থ উল্কা হইতে সুদূর

অতীতে লোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই লৌহ সহজে নষ্ট হইত না বা মরিচা ধরিত না, কাজেই উহার দ্বারা অনেক যন্ত্রাদি নির্মিত হইয়াছিল। কোথাও কোথাও উহাকে অলংকার-নির্মাণকার্যেও আদিযুগের মানবসমাজ ব্যবহার করিয়াছিল। বর্তমানে কিন্তু লৌহ উল্কার দেহাবশেষ হইতে সংগ্রহ করা হয় না। ভূপৃষ্ঠে নানাবর্ণের পাথুরিয়া মাটি আছে, তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের ভারতবর্ষেও এইরূপ লৌহখনিজ পদার্থের অভাব নাই। প্রকৃতির লৌহসম্পদ বলিতে গেলে অফুরন্ত, কাজেই বহুকাল ধরিয়া আমরা লৌহ প্রস্তুত করিয়া তাহার সাহায্যে বহুবিধ কার্য করিতে পারিব। দেশের নানাবিধ সুবিধাবৃদ্ধির সঙ্গেই আমরা দেশকে শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বহুবিধ অস্ত্র এই লৌহ সাহায্যে প্রস্তুত করিতে পারিব। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, এই সম্পদ রীতিমত আহরণ করিতে পারিলে আমরাও জগতের অজেয় জাতির অন্যতম বলিয়া জগৎসমক্ষে দাঁড়াইতে পারিব। এখন প্রয়োজন নিপুণতার সঙ্গে এই খনিজ সম্পদকে কাজে লাগানো। পূর্বেই বলিয়াছি লৌহসম্পদ বাংলার পশ্চিমপ্রান্তে ও দক্ষিণ-পশ্চিম সীমার নিকটে বহুলপরিমাণে পাওয়া যায়, অতএব বাংলাদেশেও ইহাকে প্রচুর পরিমাণে কাজে লাগানো সম্ভব। খনি হইতে লৌহ নির্গত হয় পাথুরিয়া মাটির আকারে—কোথাও ইহার রং লাল, কোথাও বা কালো। যে কোন রঙেই পাওয়া যাউক না কেন, কোনটিতেই মূল ধাতুর রূপে ইহাকে পাওয়া যায় না, বরং আমরা ইহাকে দেখি একটি যৌগিক পদার্থের রূপে। এই যৌগিক পদার্থ প্রধানত ধাতব লৌহের সঙ্গে অক্সিজেনের সম্মেলনে অথবা কোথাও স্বাভাবিক গন্ধকের সহিত সংযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। যে কোন রূপেই উহা বর্তমান থাকুক না কেন, কুশলী শিল্পীর হস্তে নানা উপায়ে উহাকে পরিবর্তিত করা হয়। এ দেশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ লৌহ-কারখানা জামসেদপুরের কথা আমরা সকলেই জানি। এই কারখানায় খনিজ অবস্থায় যে লৌহের অম্লজ পাওয়া যায় তাহাকে রূপান্তরিত করা হয়। এই রূপান্তরকার্যে প্রচুর পরিমাণে কাঠ-কয়লা বা কোক-কয়লার ব্যবহার হইয়া থাকে। যদি কাঠ-কয়লার দ্বারা

লৌহাম্লজকে রূপান্তরিত করিতে হয় তাহা হইলে প্রচুর পরিমাণে কাঠের সরবরাহ থাকা প্রয়োজন। কাঠ হইতে কয়লা উৎপাদনকার্যে অন্য কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতএব যে দেশে কাঠই কয়লার উপাদান, সেখানে অন্য নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থ আহরণ করা সম্ভব। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে পাথুরিয়া কয়লা অতি সহজে লাভ করা যায়। কাজেই কোক কয়লার জন্য এখানে এই পাথুরিয়া কয়লাই প্রযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এইজন্যই টাটানগরে পাথুরিয়া কয়লাই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কাজের সময় দেখা গেল যে, পাথুরিয়া কয়লা খনিজ অবস্থায় কয়লা ব্যতীত আরও কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের মূল উপাদান। এইজন্য কোক কয়লায় তাহাকে পরিণত করিতে হইলে অন্যান্য রাসায়নিক ধনসম্ভার তাহা হইতে আহরণ করা অতিশয় প্রয়োজন। এই ভাবে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়, তাহার যথাযথ ব্যবহার আমাদের দেশে সুদূর অতীতে হইত না। কিন্তু এখন ইহার বহুল ব্যবহার হওয়া অতিশয় প্রয়োজন। এই রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে যে সকল দ্রব্য পাওয়া যায় তাহার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, বর্তমানকালে তাহা যুদ্ধোপকরণরূপেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে পারে। অধুনা যে সকল পদার্থ বিস্ফোরকরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের অনেকগুলিই এইরূপে আহৃত পদার্থ হইতে প্রস্তুত হইতেছে।

অতএব দেখা গেল যে, খনিজ উপাদান হইতে লৌহ প্রস্তুত করিতে গিয়া অন্য আরও কতকগুলি মূল্যবান সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে। ইহাদের প্রত্যেকটি যেমন দেশের অর্থাগমের সহায় হইতে পারে, তেমনই যুদ্ধের সময় তাহারা শত্রুনিধনকার্যেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

এই কয়লা-সহযোগে লৌহাম্লজ রূপান্তরিত হইলে যে বস্তু পাওয়া যায় তাহাই সাধারণ চিনালোহা। ইহাকেই আমরা কাস্ট আয়রন নাম দিয়া থাকি। ধাতব লৌহের ইহা অপরিষ্কৃত রূপ। এই পদার্থই পরে স্টীল বা ইস্পাতে পরিবর্তিত হয়। চিনালোহা নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। লোহার দ্বারা যে কোন ঢালাই কাজ সাধারণত সম্পন্ন হয় তাহা এই

চিনালোহার সাহায্যেই হইয়া থাকে। তবে লোহার যা কিছু ভাল কাজ তাহার জন্য দরকার ষ্টীল বা ইস্পাতের। এই চিনালোহাই পরে ষ্টীলে পরিবর্তিত হইতে পারে। এই কাজের জন্য তাপ ও বায়ুর প্রয়োজন। এই পরিবর্তনকার্য লোহার কারখানায় কি ভাবে সম্পন্ন হয়, তাহা যাঁহারা জামসেদপুরের লোহার কারখানা দেখিয়াছেন তাঁহাদের অবিদিত নাই। ষ্টীল প্রকৃতপক্ষে পরিষ্কৃত লৌহ; তবে ইহার মধ্যে অতি অল্প পরিমাণে অর্থাৎ শতকরা প্রায় দেড়ভাগ অঙ্গার মিলিত থাকে। এই অঙ্গার ভাগ মিলিত না থাকিলে লোহা নরম-লোহা নামে পরিচিত হয়। তখন তাহার সাহায্যে ইস্পাতের যন্ত্রের ন্যায় মজবুত যন্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে না।

অধুনা ইস্পাত নানা শ্রেণীর প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ইস্পাতে ভিন্ন ভিন্ন ধাতু সম্মিলিত করা হয়। এই সকল ধাতুর মধ্যে নিকেল কোবাল্ট ম্যাগানিয, টাইটেনিয়াম, ক্রোমিয়াম, টাংস্টেন ও ভ্যানাডিয়ামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—এই বিভিন্ন ধাতুর সংযোগ হইতেই ইস্পাতে বিভিন্ন গুণের সঞ্চার হয়। তখন উহার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পাদিত হইতে পারে। ব্যবহারভেদে তাই ষ্টীলের শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে। একই শ্রেণীর ষ্টীল সর্ববিধ কাজে নিযুক্ত হইলে সুফল হয় না।

ষ্টীল বলিতে আমরা তাহা হইলে প্রায় সঙ্কর ধাতুই বুঝি। অঙ্গার বা কয়লার পরিমাণ যেমন ষ্টীলে বাড়িতে থাকে, তেমনই তাহার বৈশিষ্ট্যও বদলায়। মাইল্‌ড ষ্টীলে কয়লার পরিমাণ থাকে শতকরা ·০৫ হইতে ·১৫ ভাগ পর্যন্ত। তাহার প্রসার্য শক্তি (tensile strength) তত অধিক নহে। কিন্তু স্প্রিঙের জন্য যে ষ্টীল ব্যবহৃত হয়, তাহাতে কয়লার পরিমাণ থাকে শতকরা ·৭ হইতে ·৮ ভাগ পর্যন্ত। পূর্বোক্ত শ্রেণীর তুলনায় এই ষ্টীলের প্রসার্য শক্তি প্রায় দ্বিগুণ। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সার্ রবার্ট হ্যাডফিল্ড আবিষ্কার করেন যে, ষ্টীলের সহিত ম্যাগানীয ধাতু মিশ্রিত হইলে যে নূতন শ্রেণীর ষ্টীল পাওয়া যায় তাহার কাঠিন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ম্যাগানীষের পরিমাণ সাধারণত ১০ হইতে ১৫ ভাগ পর্যন্ত দিয়া যে সঙ্কর ধাতু পাওয়া যায় তাহাই ম্যাগানীষ ষ্টীল।

এইরূপ স্টীল-নির্মিত যন্ত্র সহজে ক্ষয় হয় না। এইজন্য যে সমস্ত স্থানে সমধিক ঘর্ষণের সম্ভাবনা সেখানে এইরূপ স্টীলের রেল ব্যবহৃত হয়। আবার এই স্টীলের পাত অপেক্ষাকৃত অধিক শক্ত হওয়ায় উহাকে সহজে ভেদ করা যায় না, এইজন্য যুদ্ধসজ্জায় এইরূপ স্টীলের বর্ম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিগত মহাযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ স্টীলের টুপি বা স্টীল হ্যাট প্রস্তুত হইয়া ইংরেজ-বাহিনীকে গুলি ও তীক্ষ্ণ টুকরা লোহার আঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। এই রকম স্টীল আজিও এই কার্যে নিযুক্ত হইতেছে। এই স্টীল দ্বারা যে বাক্স বা লোহার সেফ তৈয়ারি হয় তাহা ডাকাতের হাত হইতেও প্রায় সম্পূর্ণ নিরাপদ। মেশিনগানের গুলি পর্যন্ত এইরূপ স্টীলের চাদর ভেদ করিতে পারে না।

সিলিকন (Silicon) নামীয় মূল পদার্থটি বালুকা হইতে উৎপন্ন হয়। এইজন্য বালুর আর একটি নাম সিলিকা। এই সিলিকন মিশ্রিত স্টীলে শতকরা প্রায় ৫ ভাগ পর্যন্ত সিলিকন বর্তমান থাকিতে পারে। তখন এই নবনির্মিত স্টীল বৈদ্যুতিক যন্ত্রনির্মাণে বিশেষ উপযোগী হইয়া উঠে। ইলেকট্রো ম্যাগনেটের নাম সকলেই শুনিয়াছেন, বিদ্যুদ্‌বাহী ইনসুলেটেড তার লোহার গায়ে জড়াইলে লোহাটি তখন চুম্বক-গুণ প্রাপ্ত হয়—ইহাই ইলেকট্রো ম্যাগনেট। এইরূপ ইলেকট্রো ম্যাগনেট তৈয়ারি করিতে এই শ্রেণীর স্টীল বিশেষ উপযোগী। কারণ এই শ্রেণীর স্টীল অতি সহজে চুম্বক-গুণ প্রাপ্ত হয়। তেমনই বিদ্যুৎস্রোত বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই লোহাটি দ্রুত চুম্বক-গুণ হারাইয়া ফেলে। এই কাজে যখন হইতে সিলিকন স্টীলের ব্যবহার হইয়াছে তখন হইতেই বার্ষিক প্রায় ৪৫ কোটি টাকার বিদ্যুৎস্রোতের অপচয় বন্ধ হইয়াছে। অদূরভবিষ্যতে এই অপচয় নিবারণের কাজ আরও কত অধিক পরিমাণে বন্ধ হইবে, তাহার হিসাব এখনই করা সম্ভব নহে।

লোহার একটি বিশেষ দোষ উহা অতি শীঘ্র জলীয় বাষ্পের সহযোগিতায় মরিচা ধরিয়া নষ্ট হয়। এই মরিচা বন্ধ করিতে পারিলে লোহার বহুল ব্যবহার সম্ভব মনে করিয়া নানারূপে লোহাকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গ্যালভানাইয্‌ড লোহার শীট সকলেই

দেখিয়াছেন। মাইল্ড স্টীলের উপর পাতলা দস্তার একটি আস্তর জমাইতে পারিলেই গ্যালভনাইয্ড লোহার চাদর তৈয়ারি হইল। বড় বড় কারখানায় এইরূপে যে গ্যালভানাইয্ড চাদর প্রস্তুত হইতেছে তাহার দ্বারা টিনের ঘর তৈয়ার হয়। এই গ্যালডানাইয্ড লোহা দিয়াই বালতি প্রস্তুত হইতেছে। বর্তমানে বড় বড় জলের পাত্রও এই গ্যালভানাইয্ড লোহার চাদরে তৈয়ারি হইতেছে। কেবল তাহাই নহে বেড়া তার, কাঁটা তারের জাল প্রভৃতি নানাবিধ লোহার সরঞ্জাম এইরকম গ্যালভানাইয্ড লোহার সাহায্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে বলিয়া বহুদিন ধরিয়া সেগুলি ব্যবহারযোগ্য থাকে। আবার লোহার উপর রাঙের একটি পাতলা আস্তরণ দিয়াও লোহাকে মরিচার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়। এইরকম ব্যবস্থাই বিস্কুটের টিন ও কেরাসিনের টিনের জন্য করা হইয়াছে। অনেকের ভুল ধারণা যে, ঐগুলি টিন নামীয় একটি নূতন ধাতু নির্মিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা লোহার উপর টিনের আস্তর দিয়া তৈয়ারি। আর এই লোহাও পাতলা মাইল্ড স্টীলের চাদর মাত্র। এইরূপ স্টীলের উপর এনামেল চড়াইয়া সংসারের নানাবিধ ব্যবহারের তৈজসপত্রও প্রস্তুত হইতেছে। তাহা সকলেই জানেন। ইহা এনামেল বা তামচিনির তৈজস বলিয়া পরিচিত। স্টীল যখন ক্রোমিয়াম ধাতু সংযোগে প্রস্তুত হয়, তখন উহার এই বিশেষ গুণ দেখা যায় যে, তাহাতে সহজে মরিচা ধরে না। এইরূপ স্টীলই মরিচাবিহীন বা rustless স্টীল নামে পরিচিত। এই জাতীয় স্টীল বহুল পরিমাণে ছুরি তৈয়ার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আমরা যে মরিচাবিহীন ছুরিগুলি ব্যবহার করি তাহা এই স্টীল সহযোগেই নির্মিত হয়। মোটরকারের বাম্পার এবং ঐরূপ অন্যান্য লৌহনির্মিত সরঞ্জাম নির্মাণের জন্য এই শ্রেণীর স্টীলই ব্যবহৃত হইতেছে।

নিকেল স্টীলও নানা শ্রেণীর। বিভিন্ন পরিমাণে নিকেল ধাতু স্টীলের সহিত সম্মিলিত হইলে যে সঙ্কর ধাতু প্রস্তুত হয় তাহাই নিকেল স্টীল। ইহা বিভিন্ন জাতীয় প্রস্তুত হইয়াছে। নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে ইহারই ব্যবহার সমধিক হইয়া থাকে। গতিশীল যন্ত্রমাত্রই এই শ্রেণীর

ষ্টীল সহযোগে নির্মিত হয়। দ্রুতগামী যাবতীয় রেলগাড়ির এঞ্জিন এইরূপ ষ্টীলেই নির্মিত হয়। মোটরগাড়ির দেহের কাঠামোও এইরূপ শক্ত শ্রেণীর ষ্টীল ভিন্ন তৈয়ারি হয় না। যুদ্ধ-জাহাজগুলিকেও বিশেষ ভাবে শক্ত করিয়া তৈয়ারি করা হয় বলিয়া, তাহার জন্যও এই শ্রেণীর ষ্টীলই ব্যবহৃত হইতেছে। দেশরক্ষার যাবতীয় উপকরণ, যথা—কামান বন্দুক গোলাগুলি প্রভৃতি যাবতীয় সরঞ্জামও এই শ্রেণীর ষ্টীল সহযোগে নির্মিত হইতেছে। এইরূপে নির্মিত যন্ত্র যেমন শক্তিশালী তেমনই দীর্ঘস্থায়ী। বহু ব্যবহারেও ইহাদের তেমন কিছু হয় না। আমাদের যন্ত্রাগারেও ইহাদের বহুল ব্যবহার হইয়াছে।

ইন্‌ভার জাতীয় ষ্টীলের একটি প্রধান গুণ হইল এই যে, তাহা তাপের তারতম্যে প্রসারিত বা সংকুচিত হয় না। এইজন্যই ভাল দেওয়াল-ঘড়িগুলির জন্য তাহা ব্যবহৃত হয়। তাপে ধাতুনির্মিত পেণ্ডুলামের প্রসারণ বা সংকোচন হইতে থাকিলে ঘড়িতে সময় ঠিক থাকে না। ইন্‌ভার-নির্মিত দণ্ডের পেণ্ডুলাম সম্বলিত ঘড়িতে সময়ের কোন পার্থক্য হয় না।

আরও এক জাতীয় ষ্টীলের কথা এখানে বলা প্রয়োজন। এই শ্রেণীর ষ্টীল ক্রোম টাংস্টেন ষ্টীল নামে পরিচিত। এই জাতীয় ষ্টীল এত কঠিন যে, তাপে রক্তিম অবস্থায়ও উহা নরম হয় না। এই জাতীয় ষ্টীল দ্বারা লৌহ বা অন্যবিধ ধাতু কাটিবার ও ছিদ্র করিবার যন্ত্র প্রস্তুত হয়।

ষ্টীলের ব্যবহারের মধ্যে পূর্বে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটের কথা বলিয়াছি। ইলেকট্রো-ম্যাগনেটের সাহায্যে নানা কার্য সম্পাদিত হয়। তাহার মধ্যে ভার উত্তোলন কার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারী পদার্থকে স্থানান্তরিত করা অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ কাজ। সুদীর্ঘ ষ্টীল অথবা লোহার দণ্ড যেমন সহজে শক্তিশালী ইলেকট্রো-ম্যাগনেট সাহায্যে উত্তোলিত হয়, তেমনই অল্পদীর্ঘ লোহার খণ্ডও বৃহৎ ইলেকট্রো-ম্যাগনেট সহযোগে উত্তোলিত হইয়া স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। বড় বড় সেতু নির্মাণ কার্যে যে বৃহৎ লোহার দণ্ড উঠাইতে ও নামাইতে হয়, সে সবই ইলেকট্রো-ম্যাগনেট সহযোগে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

আপনারা সকলেই জানেন যে, সুদীর্ঘ চওড়া ষ্টীলের চাদর দ্বারা বড় বড় জাহাজের খোল নির্মিত হয়। এইরূপে নির্মিত জাহাজের জন্ত যথেষ্ট ব্যয় হইয়া থাকে। অল্প কিছুদিন পূর্বে আমেরিকায় ষ্টীলের রড ও কংক্রীট সাহায্যে জাহাজ নির্মাণকার্য্য সম্ভব কি না, তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। রডের সাহায্যে জাহাজের কাঠামো তৈয়ারি করিয়া তাহার মধ্যে কংক্রীট জমাইয়া সত্যই জাহাজ প্রস্তত হইয়াছে। এই রকম জাহাজ প্রস্তত করিতে অপেক্ষাকৃত অল্প টাকা ব্যয় হয়। জাহাজের কথা ছাড়িয়া দিয়া ফেরো-কংক্রীটের কথা বলিতে গেলেই বর্তমানের যত সুপ্রসিদ্ধ বিরাট অট্টালিকার কথা বলিতে হয়। ফেরো-কংক্রীট বর্তমানের শহরগুলির চেহারা একেবারে বদলাইয়া ফেলিয়াছে। আবার সুবৃহৎ সেতু প্রভৃতিও এই ষ্টীলের কাঠামোর উপর কংক্রীট সাহায্যে বহুল সংখ্যায় নির্মিত হইতেছে। দেশরক্ষার জন্য যে সকল রক্ষী-প্রাকার গঠিত হইয়াছে, সে সবই এই ফেরো-কংক্রীট সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে। যতদিন ষ্টীলের অভাব আমাদের না হয় ততদিন আমরা এই রকমেই দেশের সমৃদ্ধি বাড়াইতে পারিব, আবার দেশকে আততায়ীর হাত হইতেও রক্ষা করিতে সমর্থ হইব। বড় বড় লোহার টুকরার কথা ছাড়িয়া দিলেও ছোট ছোট টুকরাগুলিও কম প্রয়োজনীয় দ্রব্য নহে। এই ছোট ছোট টুকরা লোহাই বিস্ফোরক বোমার মধ্যে ব্যবহৃত হইতেছে। এই জিনিসই পুনরায় গলিত হইয়া নানা কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, আমাদের দেশেও সুবৃহৎ লোহার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। লৌহসম্পদে আমরা কোন জাতি অপেক্ষা দরিদ্র নহি। পরন্ত আমাদের যে অফুরন্ত লৌহ খনিজ বর্তমান, তাহার সাহায্যে আমরা কেবল যে গৃহাদি নির্মাণের উপযোগী ষ্টীল তৈয়ারি করিতে পারি তাহাই নহে, পরন্ত ইহাকে অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে সম্মিলিত করিয়া আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর ষ্টীল এখানেই প্রস্তত করিতে পারিব।

রেয়ন শিল্প

স্বাভাবিক রেশম একদিন বাংলার বিশিষ্ট সম্পদ ছিল। আজও যে বাঙালী সে সম্পদ হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহা নহে, তবে নানা কারণে এখন আর অকৃত্রিম অর্থাৎ স্বাভাবিক উপায়ে পোলুপোকার দ্বারা প্রস্তুত রেশমের চাহিদা তেমন নাই। এই শ্রেণীর রেশমের প্রচলনও ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। রেশমের চাকচিক্য কিন্তু আমরা ভুলি নাই, পরন্তু অল্পতর মূল্যে প্রায় তেমনই চকচকে উজ্জ্বল এবং বর্ণসম্পদে ততোধিক গরীয়ান কৃত্রিম রেশমের রূপে আমরা এমনই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, আর অকৃত্রিম রেশমের কথা তেমন ভাবি না। জাপানের কল্যাণে পরিধানের প্রায় এমন বস্ত্র নাই, যাহা কৃত্রিম রেশম দ্বারা প্রস্তুত হইয়া এদেশে আসে নাই। এই পরিধেয় বস্ত্র দামে এত শস্তা যে, মানুষের রেশম পরিধানের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে বর্তমানে মোটেই বেগ পাইতে হয় না। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, কৃত্রিম রেশম পদার্থই বা কি, আর কি ভাবেই বা ইহাকে প্রস্তুত করা যায়। কৃত্রিম রেশম প্রকৃত পক্ষে সব্জীজাতীয় পদার্থ হইতেই নির্মিত হয়। আজও সব্জী পদার্থই এর প্রধান উপাদান। তুলা ও ঐ জাতীয় অন্য পদার্থ, যথা—বৃক্ষের গুঁড়ি, ছাল প্রভৃতি, এই কার্যে নিয়োজিত হইতেছে। গাছের গুঁড়ি মানুষের চেষ্টায় পরিবর্তিত হইয়া যখন খাদ্যসামগ্রী—চিনিতে পরিবর্তিত হইতে পারিয়াছে, তখন ইহার সাহায্যে যে পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য ব্যাপার কি? বল্কল আদিম যুগের লোক এমনিই পরিধেয় হিসাবে ব্যবহার করিত। আজ আমরা বিংশ শতাব্দীতে তাহার রূপান্তর করিতে সমর্থ হইয়াছি বলিয়া তাহার দ্বারা নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া চলিয়াছি। সংক্ষেপে এই রূপান্তর দান কার্যের সহজ বিবরণ এখানে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

কৃত্রিম রেশমের আবিষ্কার প্রয়োজন ছিল পাশ্চাত্য দেশের জন্য। আমাদের দেশে পোলুপোকার চাষ প্রচুর পরিমাণে হইত বলিয়া এদেশে

স্বাভাবিক রেশমের অভাব ছিল না। প্রাচ্য দেশ হইতেই এই দ্রব্যটি পাশ্চাত্ত্য দেশে রপ্তানি হইত। কাজেই সেখানে ইহার মূল্যাধিক্য ছিলই, পরন্তু উহা দুষ্প্রাপ্যও ছিল। অতএব সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগেই অনেকের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়, এবং ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দেই হুক্ বলেন যে, হয়তো কোন কুশলী শিল্পী কৃত্রিম উপায়ে এই পদার্থ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবেন। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দেই রীমার এই বস্তুর প্রস্তুতবিধির প্রথম চেষ্টা করেন। কিন্তু তখনও এই সম্বন্ধে সঠিক কথা কেহ জানিত না। শোবার ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম রয়াল সোসাইটির নিকট এই বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং প্রকৃত কৃত্রিম রেশম ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আঁদে-মারই প্রথম জগৎসমক্ষে উপস্থিত করেন। পরে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সার্ জে. ডব্লু. সোওয়ান, অপেক্ষাকৃত উন্নত কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করিয়া সকলকে দেখান। কিন্তু তিনি তাঁহার এই আবিষ্কার দ্বারা কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিবার চেষ্টা করেন নাই, এই কার্য ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম হিলিয়ার দে শারদোনে সম্পাদন করেন। ইনিই প্রায় ছয় লক্ষ ফ্রাঁ মূলধন লইয়া ফ্রান্সের বেসাসোঁ নগরে কারখানা স্থাপন করেন। তাহার পর বিভিন্ন দেশে নানা ব্যক্তি বিভিন্ন উপায়ে এই পদার্থটি প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে নানা শ্রেণীর কৃত্রিম রেশম বা রেয়নের সহিত আমরা পরিচিত হইয়াছি।

পূর্বে বলিয়াছি যে, গাছের গুঁড়ি ছাল প্রভৃতি রূপান্তরিত হইয়া রেয়নের সৃষ্টি করে। যে পদার্থ এইরূপে সজী-জগৎ হইতে আহৃত হয় তাহাই সেলিউলোয নামে পরিচিত। তুলা, কাগজ, কাপড়, সবই এই জাতীয় পদার্থ। এই পদার্থকে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শুৎযেন বারজার সেলানিঞ্জে প্রথম পরিবর্তিত করেন। সেই তথ্যই ক্রস অ্যাণ্ড বিভান কোম্পানি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কাজে লাগাইয়া ইংলণ্ডে এই পদার্থ প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রাথমিক পরীক্ষা ব্যাপারে এই কোম্পানি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াও উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তারপরে গভর্মেণ্টের সাহায্যে পুষ্ট হইয়া ইহারাই এরোপ্লেনের

জন্য এই পদার্থ সহযোগে ভার্নিশ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। আজও রেয়নের উপকরণই বিভিন্ন রঙের সহযোগিতায় বহুল পরিমাণে মোটরগাড়ি প্রভৃতির দেহসৌষ্ঠব বৃদ্ধি কার্যে নিয়োজিত হইতেছে। কিন্তু তখনও ইহার দ্বারা রেয়ন নির্মিত হয় নাই। পরে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মাইলস্ সেলিউলোযের রূপান্তর করণের যে নূতন প্রথা আবিষ্কার করেন, তাহাই ড্রেফাস, স্পন্তন, ডার্বি প্রভৃতি ব্যক্তির সাহায্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া রেয়ন নির্মাণে সহায়তা করিয়াছে।

এই রেয়ন প্রধানত চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। ইহাদের প্রথমটি আজও শার্ডোনে সিল্ক নামে উহার আবিষ্কর্তার নামের সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন কিউ-প্রামোনিয়াম রেয়ন নামে পরিচিত। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী যথাক্রমে ভিস্‌কোয ও অ্যাসিটেট সিল্ক নামে খ্যাত। যে প্রথাতেই প্রস্তুত হউক না কেন, অবশেষে রেয়ন মাত্রই একটি বিশিষ্ট রূপে আবির্ভূত হয় ও তাহাকে নানাবিধ রঙের সাহায্যে রঙিন রেশমসূত্রে পরিবর্তিত করিয়া পরে বিভিন্ন বস্ত্র নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত করা হইয়া থাকে।

সেলিউলোয অর্থাৎ তুলা জাতীয় পদার্থ, অথবা গাছের ছাল প্রভৃতি প্রথমে ভালরূপে পরিষ্কৃত হইলে পরে উহাকে ব্লিচিং প্রথার সাহায্যে শুভ্র-সুন্দর-মণ্ডের আকারে পরিবর্তিত করা হয়। এই মণ্ড শুষ্ক হইলে, সালফিউরিক অ্যাসিড বা গন্ধকীয় অম্ল ও নাইট্রিক অ্যাসিডের সহিত মিশ্রিত করিলেই ক্রমে উহা সেলিউলোয নাইট্রেটে পরিণত হয়। নাইট্রিক অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়াইয়া বা কমাইয়া এই সেলিউলোয নাইট্রেট ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হইতে পারে। ইহাদেরই এক শ্রেণীর পদার্থ বিস্ফোরক নির্মাণে ব্যবহৃত হইতেছে। আবার অন্য শ্রেণীর পদার্থ দ্বারা ভার্নিশ বা ল্যাকার প্রস্তুত হইতেছে। এই জাতীয় পদার্থই রেয়ন নির্মাণেও নিয়োজিত হয়। রেয়নের সূক্ষ্ম তন্তু কেবলমাত্র সেলিউলোয নাইট্রেট দ্বারা প্রস্তুত হইলে তাহাকে বস্ত্ররূপে ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল হইত, কারণ সে বস্ত্র সহজেই অগ্নি সংযোগে জ্বলিয়া উঠিত। এইজন্যই তন্তু প্রস্তুত হইবার পর সেলিউলোয নাইট্রেটের এই

নাইট্রেট অংশ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বাদ দিতে হয়, তবেই তাহা ব্যবহারযোগ্য রেয়নসূত্রে পরিণত হয়।

সেলিউলোয অ্যাসিটেটও ঐ পূর্বোল্লিখিত শুভ্র সেলিউলোযমণ্ড হইতেই তৈয়ারি হয়। এগুলি প্রস্তুত হইলে ঐ অ্যাসিটেটের দ্রবণ সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত নলের মধ্য দিয়া প্রচণ্ড চাপ সহযোগে নির্গত হইলেই সূক্ষ্ম সূতার আকারে বাহির হয়। এই সূতার সঙ্গে তখনও যে দ্রাবক মিশ্রিত থাকে তাহাকে তাড়াইলেই ব্যবহারযোগ্য রেয়নসূত্র পাওয়া যায়। সূত্রের আকারে না পরিণত করিয়া, দীর্ঘ পাতের আকারেও এই সেলিউলোয অ্যাসিটেট জমানো হয়। ঐরূপে জমানো শীট বা পাতগুলিই স্বচ্ছ কাগজের আকারে প্রস্তুত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। এই কাগজই সেলোফ্যান নামে পরিচিত। অধুনা ইহার বহুল ব্যবহার ঘটিয়াছে। চকোলেট সিগারেট প্রভৃতির বাক্স জড়াইবার জন্য এই স্বচ্ছ কাগজগুলি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। ইহাকে নানারকম রঙে রঙানোও সম্ভব। ঐরূপ রঙিন সেলোফ্যান বহুল পরিমাণে কৃত্রিম ফুল প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। এইরূপে প্রস্তুত ফুল বহু সংখ্যায় পাশ্চাত্য দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দেখিতে এগুলি যেমন তাজা ও সুন্দর, তেমনই বহুদিন পর্যন্ত ইহাদিগকে অবিকৃত অবস্থায় রাখা চলে।

বর্তমানে যে কৃত্রিম রেশম সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে, তাহাই ভিস্‌কোয রেয়ন। গত ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোট পাঁচ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচ শত মণ রেয়ন প্রস্তুত হয়। তাহার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় চার লক্ষ ত্রিশ হাজার মণ এই ভিস্‌কোয রেয়ন, শতকরা ৮ ভাগ অ্যাসিটেট রেয়ন এবং শতকরা ৪ ভাগ মাত্র শার্ডোনে রেয়ন। চতুর্থ শ্রেণীর কিউপ্রামোনিয়াম রেয়নের পরিমাণ ছিল শতকরা ৫ ভাগ মাত্র। ভিস্‌কোয রেয়নের জন্য যে মূল পদার্থ ব্যবহৃত হয় তাহা গাছের গুঁড়ির চূর্ণ; কিন্তু অ্যাসিটেট রেয়নের জন্য প্রধানত টুকরা তুলা বা ঐ জাতীয় সেলিউলোযের প্রয়োজন হয় অধিক। অতএব দেখা যাইতেছে, ভিসকোয রেয়নের প্রাথমিক উপাদান অতি সাধারণ ও সহজলভ্য পদার্থ। কাগজের জন্যও এই

জাতীয় সেলিউলোয ব্যবহৃত হইতেছে। অতএব ভিসকোয রেয়ন প্রস্তুত করিবার মূল উপাদান আমাদের দেশেও পাওয়া যায় ও চেষ্টা করিলে এই পদার্থ আমরাও বহুল পরিমাণে প্রস্তুত করিতে পারি। ইহার জন্য দ্বিতীয় উপাদান ক্ষার দ্রব্য, যথা—কষ্টিক সোডা, ও তৃতীয় পদার্থ—কার্বন ডাইসালফাইড প্রয়োজন হয়। ইহাদের মধ্যে কষ্টিক সোডা প্রচুর পরিমাণে সাবানের কারখানায় নিয়োজিত হয়। বর্তমানে এই পদার্থ প্রস্তুত করিবার জন্য এদেশেও যথেষ্ট চেষ্টা চলিয়াছে। শেষোক্ত কার্বন ডাইসালফাইড প্রস্তুতের জন্য গন্ধকের প্রয়োজন। এই পদার্থটি এদেশে বর্তমানে প্রস্তুত হয় না। ইহা প্রস্তুত করিতে পারিলেই ভিসকোয রেয়ন প্রস্তুত করা এদেশে সহজসাধ্য হইবে। বর্তমানে এদেশে আমরা কৃত্রিম রেশমের কোনটিই প্রস্তুত করি না। অতএব এদেশের বাজারে যাহা কিছু কৃত্রিম রেশম পাওয়া যায়, তাহার মূল উপাদান রেয়নসূত্র এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রস্তুত বস্ত্রও বিদেশ হইতে এদেশে আমদানি হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ভিসকোয রেশমের প্রস্তুত বিধি পূর্বোল্লিখিত অ্যাসিটেট সিল্কের অনুরূপ। রেয়নসূত্র এখানে ক্ষারসম্বলিত অবস্থায় পাওয়া যায়। ঐ ক্ষার পদার্থ অম্লযোগে এবং জল সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইলে তাহা হইতে রেয়নসূত্র কার্যে ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এইরূপে প্রাপ্ত সূত্রকে পুনরায় ব্লিচিং ক্রিয়ার সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে শুভ্ররূপ প্রদান করা যায়। রঙিন সূত্র এই শুভ্র সূত্র হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর শুভ্র রেয়নসূত্র বিভিন্ন রঙের সাহায্যে রঞ্জিত হয়।

কিউপ্রামোনিয়াম বেয়ন অবশ্য অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয় না। সেলিউলোয অতি সূক্ষ্ম চূর্ণের আকারে তুঁতিয়া ও অ্যামোনিয়ার মিশ্র দ্রবণে সহজেই দ্রবীভূত হয়। তখন এই দ্রবণ হইতেই রেয়নসূত্র পূর্বোল্লিখিত উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। এই সূত্র হইতে তুঁতিয়া ও অ্যামোনিয়া তাড়াইবার জন্য অম্ল পদার্থের প্রয়োজন এবং পরে ঐ পদার্থ-নির্মিত সূত্র পরিষ্কৃত হইলে ইহাকেও কার্যোপযোগী শুভ্র সূত্রের রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রেয়নের সঙ্গে আরও যে সকল পদার্থের নিকট সম্বন্ধ আছে তাহাদের অল্প কিছু পরিচয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই সঙ্গে আরও দুই-একটি জিনিসের উল্লেখ করা ভাল। পূর্বে কামান-বন্দুকের গোলা-গুলির জন্য যে বিস্ফোরক বারুদ ব্যবহৃত হইত, তাহার জন্য কয়লার সঙ্গে সোরা-চূর্ণ, মূল উপাদানের অন্যতম পদার্থ ছিল। তাহার পর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নোবেল একদিন ডিনামাইট আবিষ্কার করেন। ইহার জন্য নাইট্রিক অ্যাসিড গ্লিসারিন-সহযোগে বিস্ফোরকে রূপান্তরিত হয়। পরে দেখা গেল সেলিউলোযের সঙ্গে গ্লিসারিনের নিকট সম্বন্ধ বর্তমান। ফলে সেলিউলোযকে নাইট্রিক অ্যাসিড যোগে পরিবর্তিত করিয়া ধুমহীন বারুদ প্রস্তুত হইল। এই পদার্থই নাইট্রো-সেলিউলোয। এখন নাইট্রিক অ্যাসিডের পরিমাণের উপর নাইট্রো-সেলিউলোযের ব্যবহারবিধি নির্ভর করিবে। যদি অধিক মাত্রায় নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে সে নাইট্রো-সেলিউলোয বিস্ফোরক রূপেই ব্যবহৃত হইবে। অল্পতর পরিমাণে ইহা সেলিউলোযকে সেলিউলয়েডে পরিণত করে।

এই শ্রেণীর আর একটি নাইট্রো-সেলিউলোয বহুল পরিমাণে সিনেমাটোগ্রাফ ফিল্ম প্রস্তুতকার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেলিউলোয অ্যাসিটেটও এই কার্যে নিযুক্ত হয়। সেলিউলাজ নাইট্রেট সাহায্যে যে ফিল্ম প্রস্তুত হয় এই কার্যের জন্য তাহার উপযোগিতা সেলিউলোজ অ্যাসিটেট নির্মিত ফিল্ম অপেক্ষা অধিক। কিন্তু নাইট্রো-সেলিউলোয ফিল্ম অতি সহজ দাহ্য, অথচ অ্যাসিটেট সেলিউলোয ফিল্ম সহজে পুড়িবে না।

ছেলেদের খেলিবার সামগ্রী সেলিউলয়েড দ্বারা প্রস্তুত হয়। উহাও একরূপ সেলিউলোয নাইট্রেট। বর্তমানে নানাবিধ ইলেকট্রিক রোধক যন্ত্রও এই সকল দ্রব্যের সাহায্যে প্রস্তুত হইতেছে। তবে সেলিউলোযের সঙ্গে আরও কতকগুলি দ্রব্য এই কার্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে কর্পূরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বর্তমানের কৃত্রিম রেশম রূপান্তরিত

সজীপদার্থ মাত্র। স্বাভাবিক রেশম কিন্তু কীটদেহনিঃসৃত রসের পরিবর্তন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু প্রথম দর্শনে এই পার্থক্য চোখে পড়ে না। স্বাভাবিক রেশমনির্মিত বস্ত্র যথেষ্ট হাল্কা। কিন্তু রেয়ন বস্ত্র অপেক্ষাকৃত ভারি। রেয়ন বস্ত্রে নানাবিধ বর্ণের সমাবেশ সহজে করা যায়। স্বাভাবিক রেশম সহজে রং গ্রহণ করে না। কতকগুলি বিশিষ্ট রংই স্বাভাবিক রেশমে সঞ্চার করা সম্ভব। কিন্তু রেয়নের জন্য অধিকতর সংখ্যায় নানাবিধ রং দেওয়া যাইতে পারে। প্রধানত এ কারণেও বর্তমানে স্বাভাবিক রেশমী বস্ত্র অপেক্ষা এই বেয়ন বস্ত্রের চাহিদা অধিক। অবশ্য দামের কথা ভুলিলে চলিবে না, রেয়ন বস্ত্রের দাম স্বাভাবিক রেশমী বস্ত্রের তুলনায় অনেক কম।

রেশম ও রেয়নের গোড়ার কথা কিছু বলা গেল। এই দুইটি পদার্থের তুলনা করিয়া পরখ করা সম্বন্ধে কোন কথাই এখনও বলি নাই। এই সম্বন্ধেও একটি কথা উল্লেখ করা দরকার মনে হয়। স্বাভাবিক রেশমের একটি ছোট সুতা আগুনে পোড়াইলে দেখা যায় উহার জলন্ত অগ্রভাগ ক্রমেই গুটি পাকায় ও একটি বিশিষ্ট দুর্গন্ধ ছড়ায়। কোন পাখির পালক পোড়াইবার সময়ও এই একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু রেয়নসূত্র সোজাসুজি পুড়িয়া যায় তাহাতে ঐরূপ কোন গন্ধ পাওয়া যায় না।

প্লাসটিক শিল্পের পরিচয়

কাদা ও চিনামাটি জলে ভিজিয়া নমনীয় অবস্থায় শিল্পীর হাতে নানাবিধ আকার গ্রহণ করিয়া থাকে। উহাদিগকে শুকাইয়া পরে উত্তাপ দ্বারা স্থায়ী আকার প্রদান করা হয়। যাবতীয় নমনীয় পদার্থ সহযোগে, এইরূপে অল্প তাপমাত্রায় এবং বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে নানাবিধ প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া, পরে

তাপমাত্রার পরিবর্তন দ্বারা অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংযোগে ঐ বিশিষ্ট আকারকে স্থায়িত্ব প্রদান করিয়া কার্যোপযোগী নানা দ্রব্য পাওয়া যায়। রজন, ধূনা ও বিশিষ্ট বৃক্ষনির্যাস এই জাতীয় পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল স্বাভাবিক উপাদান ব্যতীত কতকগুলি নূতনতর পদার্থ রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে বর্তমানে প্রস্তুত হইতেছে এবং উহাদের ব্যাপক ব্যবহার দ্বারা একটি নূতনতম শিল্প-প্রতিষ্ঠান ক্রমশ গঠিত হইয়া উঠিতেছে। এই জাতীয় নমনীয় পদার্থের জন্য পূর্বোল্লেখিত কোলটার বহুলরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্বে বলিয়াছি যে কোলটার অতিশয় জটিল শ্রেণীর মিশ্রণ। ইহা হইতে অনেকগুলি পদার্থ ই পাওয়া যায়, কিন্তু এই বিভিন্ন উপাদানকে সহজে পৃথক করা যায় না।

রাসায়নিক পদার্থ হইতে রজনজাতীয় পদার্থের উৎপত্তি সর্বপ্রথম জার্মান রাসায়নিক জারহার্ট ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্য করেন। তিনি সোডিয়াম স্যালিসিলেট লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন, ইহারই মধ্যে রজনজাতীয় পদার্থের উৎপত্তি লক্ষ্য করিয়া তিনি তখন বিরক্তই হইয়াছিলেন। কারণ উহা তাঁহার অভিপ্সিত পদার্থ ছিল না। তিনি তখন ভাবিতে পারেন নাই যে, তাঁহার ঐ পরীক্ষার ফলে ভবিষ্যতে নূতন জাতীয় রজন, রাসায়নিক পরীক্ষাগারে নির্মিত হইয়া, একটি বিরাট শিল্পের জন্মদান করিবে। ক্লীবার্গ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কার্বলিক অ্যাসিড ও ঐ জাতীয় পদার্থের সহিত ফরম্যালডিহাইডের সংযোগ দ্বারা নূতনতর রেযিন নির্মাণ করিলেন। এইরূপ রেযিনের উৎপত্তি সম্বন্ধে জৈব রসায়নের সুবিখ্যাত শিক্ষাগুরু বায়ার বহুপূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। ক্লীবার্গের পরেও বহু ব্যক্তি এইরূপ রেযিন জাতীয় পদার্থ আরও অন্যবিধ উপায়ে প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লা বা গালার ন্যায় স্বভাবজাত রেযিন সহযোগে ভারতীয় মহিলার হাতের কাঁকন হইতে আরম্ভ করিয়া কলের গানের রেকর্ড পর্যন্ত বহুবিধ পদার্থ নির্মিত হইয়াছে।

গালার কিন্তু কতকগুলি খুঁত দেখা যায়। উহার দ্বারা প্রস্তুত সামগ্রী এমন কি রৌদ্রের উত্তাপ পাইলেও ক্রমশ নরম হইয়া আকার

পরিবর্তন করে। কাজেই ইহাকে সর্বদেশে এবং সর্বকালে সমান ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। অধিকন্তু ভাগ্যবান বাঙালীর দেশে গালার চাষ হইলেও ইউরোপীয় কোন দেশেই উহা জন্মায় না। কাজেই ঐ দেশীয় বৈজ্ঞানিকেরা গালায় ন্যায় অন্যবিধ পদার্থের অন্বেষণে বহুকাল ক্ষেপণ করিয়া অবশেষে এই স্বভাবজাত রেযিনের কতকগুলি অনুকল্প আবিষ্কার করিলেন। কিন্তু পরীক্ষাগারে নির্মিত এই সকল সংশ্লেষাত্মক পদার্থগুলি এরূপ সহজে কঠিন আকারপ্রাপ্ত হইতেছিল যে, উহাদের আবিষ্কার গোড়ার দিকে তাঁহাদিগকে মোটেই আশা বা আনন্দ দিতে পারে নাই। কিন্তু আরও পরবর্তী যুগের কর্মীরা এইরূপ সংশ্লেষাত্মক রেযিনকে কিরূপে নমনীয় আকারে রাখিতে পারা যায়, তাহা আবিষ্কার করায় এখন এই সকল রেযিনের ব্যাপক ব্যবহার ঘটিয়াছে।

আমেরিকাবাসী লুফ্ৎ, ফিনল ও ফরম্যালডিহাইড হইতে একটি রেযিন প্রস্তুত করেন, তাহার দ্বারা রাসায়নিক পদার্থ রাখিবার জন্য বোতল ইত্যাদি প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং তাহাকে সূত্রের আকারেও পরিণত করা গিয়াছিল। ফ্রান্সে দেলেয়ার কৃত্রিম অ্যামবর এবং ইংলণ্ডে স্টোরীও পরবর্তী কালে ঐ জাতীয় পদার্থ প্রস্তুত করিতে মনোনিবেশ করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এদিকে ইহাদের সকলের চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। কারণ যে সকল সামগ্রী ঐ কৃত্রিম পদার্থ হইতে প্রস্তুত হইল তাহাদিগকে কাঠিন্য দান করিতে যাওয়ায় উহারা ছিদ্রবহুল হইয়া পড়ে। কিন্তু অবশেষে গত ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর বেকেল্যাণ্ড কৃত্রিম রেযিন প্রস্তুতের জন্য ইংলণ্ডে যে পেটেণ্ট বা অধিকারপত্র লাভ করেন, তাহার ফলে এইরূপ পদার্থ বহুলপরিমাণে নির্মিত হইয়াছে এবং আজিও হইতেছে।

প্লাসটিক্স বা নমনীয় পদার্থকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর প্লাসটিক্স বিভিন্ন উপাদানের অণুর পরস্পর সংযোগ দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। এইরূপ আণবিক সংযোগ রাসায়নিকের ভাষায় সংহতি বা কন্‌ডেন্‌সেশন নামে পরিচিত।

কাজেই আমরা এই শ্রেণীর প্লাসটিক্সকে সংহতি প্লাসটিক বলিতে পারি। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর প্লাসটিক একই পদার্থের একাধিক অণুর

পরস্পর সংহতি সংযোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাকে পলিমেরিযেশন বা বহুসংযোগক্রিয়া বলিতে পারা যায়। অতএব দ্বিতীয় শ্রেণীর প্লাসটিককে—বহু সংযোগোৎপন্ন প্লাসটিক বলিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত ফিনল্ ফরমালডিহাইড শ্রেণীর রেযিন প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইউরিয়া ফরম্যালডিহাইড ও কেযিন ফরমালডিহাইড জাতীয় রেযিনও এই একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রবারের ন্যায় নমনীয় পদার্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। স্টাইরিন, কুমারন, থ্যালিক অ্যাসিড এবং অ্যাক-রাইলিক অ্যাসিড প্রভৃতি পদার্থ হইতে উৎপন্ন রেযিনও এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এইগুলির কেহ বা পার্সপেক্স কেহ বা অ্যালকিড কেহ বা প্লিপ্‌টল নামে পরিচিত হইয়াছে। ইহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এই কৃত্রিম রেযিনশিল্প অতি অল্প সময় মধ্যে কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, গত ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কোলটার রেযিনের পরিমাণ ৪ কোটি ১৬ লক্ষ ২৯ হাজার পাউণ্ড ছিল। কিন্তু ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহা বাড়িয়া ৫ কোটি ৬০ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ডে দাঁড়ায়। ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি হওয়ায় ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ৯ কোটি ৯৩ হাজার পাউণ্ড এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৬৪ হাজার পাউণ্ড কৃত্রিম রেযিন কেবলমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই প্রস্তুত হইয়াছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর অ্যাল্‌কিড রেযিন প্রস্তুতের জন্য ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ২৭ হাজার পাউণ্ড থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এই পদার্থটি ঐ পরিমাণের অর্দ্ধেক অপেক্ষাও কম ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে উহার পরিমাণ বাড়িয়া প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছিল। জার্মান রসায়নাগারে এই পদার্থটি কৃত্রিম নীলবড়ি প্রস্তুতের জন্য নিযুক্ত হইত। তখন উহাকে গন্ধকীয় অম্ল ও পারদ সালফেট সহযোগে ন্যাফথলিন হইতে প্রস্তুত করা হইত; কিন্তু বর্ত্তমানে আমেরিকায় ন্যাফথলিনের সহিত অক্সিজেন সংযোগের জন্য একটি স্পর্শক্রিয় পদার্থ সাহায্যে বাতাসের অক্সিজেনকেই কাজে লাগানো হইয়াছে। আমেরিকায় ইহার জন্য সুবিরাট কারখানা স্থাপিত

হইয়াছে। এদেশেও অল্পদিন হইল এই প্রক্রিয়ায় ন্যাফথলিন হইতে সামান্য পরিমাণে থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড প্রস্তুত হইতেছে। আমেরিকার কারখানাটির আয়তন সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তথায় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কেবল মাত্র ৫৬ লক্ষ ১৪ হাজার পাউণ্ড থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ কোটি ১২ লক্ষ ৪৪ হাজার পাউণ্ড।

আলকাতরা হইতে প্রাপ্তব্য বহুবিধ পদার্থের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাহার কোনটি ঔষধ প্রস্তুতকল্পে, কোনটি রঞ্জনশিল্পের জন্য, কোনটি বীজাণুবিনাশী কার্যে এবং কোনটি বিস্ফোরক প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। আলকাতরা হইতে প্রাপ্তব্য নানাবিধ উপাদানের মধ্যে বেনযিন, টলুইন, ফিনল, ক্রেসল, ন্যাফথলিন প্রভৃতির কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহাদের মধ্যে ফিনল এবং ক্রেসল বহুল পরিমাণে প্লাসটিক শিল্পে নিয়োজিত হইয়াছে। বেনযিন এবং টলুইন হইতেও উক্ত পদার্থ দুইটি প্রস্তুত হইতে পারে। কাজেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে কয়লা থাকায় প্লাসটিক শিল্পের কাঁচা মালের এখানে কখনও অভাব ঘটিবে না। অধিকন্তু কোক হইতে মিথানল প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া রেযিন-শিল্পের প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় উপাদানটিও বহু পরিমাণে এদেশেই প্রস্তুত হইতে পারিবে। মিথানলকে উডস্পিরিট বা কাঠের সুরা বলিয়াও পরিচিত করা যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ৯২ হাজার হেক্টোলিটার পরিমাণ মিথানল বহির্দেশে রপ্তানি করিয়াছিল। কিন্তু ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি হইতে হাজার হাজার গ্যালন কৃত্রিম কাষ্ঠসুরা বা মিথানল নিউইয়র্ক বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং কাষ্ঠসুরার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যে মূল্য নির্দিষ্ট ছিল, তাহার অর্ধেক মূল্যে জার্মান মিথানল তথায় বিক্রীত হইতে থাকে। পরে কিন্তু স্বাধীন আমেরিকা নিজ দেশীয় কোকের সমুচিত ব্যবহার দ্বারা ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ১২ কোটি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ২৮১ পাউণ্ড সংশ্লেষাত্মক মিথানল উৎপাদন করে। এই কাষ্ঠসুরা বায়বীয় অক্সিজেন সহযোগে স্পর্শক্রিয় পদার্থের

দ্বারা ফরমালডিহাইডে পরিণত হইয়া থাকে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা এ দেশের কোক লইয়া এখনও এই মিথানল প্রস্তুত করিবার প্রতি দৃষ্টিপাত করি নাই। ইহার কারণ আমাদিগের উদাসীনতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যদি এই ঔদাসীন্য আমাদের উপযুক্ত জ্ঞান ও শিক্ষার অভাববশত ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে উহার ক্ষমা নাই। কিন্তু আমি মনে করি যে, এ দেশীয় ধনিক-সম্প্রদায়ের দূরদর্শিতার অভাবের জন্যই আমরা আজিও এইরকম প্রয়োজনীয় শিল্পের প্রতি দৃষ্টিপাত করি নাই। আশু ইহার প্রতিকার প্রয়োজন।

এখন প্লাসটিক প্রস্তুত-ক্রিয়া সম্বন্ধে অল্প একটু আলোচনা করিতে চাই। বিভিন্ন উপাদানের সহিত ফরমালডিহাইডের সংহতি-ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সম্পাদন করা প্রয়োজন হয়। কখনও বা প্লাসটিক পদার্থের প্রাথমিক উপাদান নির্মাণের জন্য সর্বাগ্রে এই সংহতিকার্য সম্পাদন করিতে হয়। আবার কখনও বিভিন্ন উপাদান মিশ্রিত করিয়া উহা হইতে বিভিন্ন আকারের আধার প্রস্তুত করিবার পর তাহাকে ফরমালডিহাইড দ্রাবণে নিমজ্জিত করিয়া সংহতিকার্য সম্পন্ন করা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে প্রস্তুত রেযিন লইয়া অন্যান্য উপাদানের সহিত মিশ্রিত করিবার পর তাহাকে ইপ্সিত আধারের আকার দান করিবার পরে বিবিধ উপায়ে উহাকে আঘাতসহ রূপ ও কাঠিন্য প্রদান করা হইয়া থাকে। এখন দেখা যাউক, প্লাসটিক প্রস্তুতকার্যে আর কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বিত হয়।

প্লাসটিক বলিতে আমরা ঠিক কি বুঝি? প্লাসটিক ঠিক একটি এমন পদার্থ যাহা সহজেই নমনীয় এবং যাহাকে ইচ্ছানুযায়ী আকার প্রদান করা সম্ভব। পূর্বোক্ত গালা নির্মল অবস্থায় অন্য পদার্থ নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয় না, পরন্তু উহার সহিত আরও কতকগুলি পরিপূরক পদার্থ মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। যাঁহারা গালার কাঁকন তৈয়ারি করিতে দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, গালার সহিত একরূপ মাটির ন্যায় চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পরে উহাকে ইচ্ছানুরূপ আকার প্রদান করা হয়। এখানে ঐ মাটিমিশ্রিত গালাই প্লাসটিক, তেমনই যে কোন মূল

প্লাসটিকের সহিত আরও কতকগুলি পদার্থ যথাসম্ভব সূক্ষ্ম চূর্ণের আকারে মিশ্রিত করা হয়। কিন্তু দেখিতে হইবে যে, ঐ চূর্ণের পরিমাণ যেন ততটা অধিক না হয় যাহাতে মূল পদার্থটির নমনীয়তা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। এইরূপে মিশ্রিত পদার্থটিই সাধারণ প্লাসটিক। রাসায়নিক রেযিন মূল প্লাসটিক হিসাবে অন্যান্য পদার্থের ধারক-স্বরূপ কাজ করে; এবং এই মূল প্লাসটিকের পরিমাণ সাধারণত শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ পর্যন্ত দিতে হয়। অবশিষ্ট উপাদান পরিপূরক মাত্র। উহাদের কোন ধারক শক্তি থাকে না। এই পরিপূরক পদার্থের মধ্যে রংচূর্ণ একটি বিশিষ্ট উপাদান। শ্রেষ্ঠ ধরনের প্লাসটক সাধারণত বর্ণহীন হইয়া থাকে। উহাকে ইচ্ছানুযায়ী রং দিয়া বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তুত করা হয়। পরিপূরক পদার্থ দ্বিবিধ হইতে পারে। হয় সাধারণ চূর্ণ, যেমন—জীপসাম, ব্যারাইটিস, খড়িচূর্ণ, অভ্রচূর্ণ, ম্যাগনেসিয়া প্রভৃতি, নয় উহা আঁশযুক্তও হইতে পারে, যথা—অ্যাস্‌বেস্টয, সূক্ষ্ম তুলার গুঁড়া, রেশমের উচ্ছিষ্ট অংশ অথবা কাষ্টচূর্ণও এই কার্যে নিয়োজিত হইতে পারে। রেযিনের সহিত প্রয়োজনানুযায়ী পরিপূরক পদার্থ ও রঙের গুঁড়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই মোল্ডিং চূর্ণ (ছাঁচে পড়িবার চূর্ণ) নামে পরিচিত। সুপ্রসিদ্ধ বেকেলাইট-মোল্ডিং চূর্ণ ফিনল ফরমালডিহাইড রেযিন হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ফরমালডিহাইড ও ফিনল এই দ্বিবিধ উপাদান একটি স্পর্শক্রিয় পদার্থের সহিত কোন পাত্রে মিশ্রিত করা হয়। অল্পক্ষণ মধ্যেই এই মিশ্রণ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এই উত্তাপের পরিমাণ স্পর্শক্রিয় পদার্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। উত্তাপের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিছুক্ষণ পর এই মিশ্রণ হইতে ফাঁপা রবারের ন্যায় একটি নমনীয় পদার্থ বাহির হইয়া আসে; ইহাই রেযিন। ইহাকে জল দ্বারা ধৌত করিলে উহা কাজের উপযোগী হইয়া থাকে। রাসায়নিকের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন গুণসম্বলিত রেযিন এইরূপে উৎপন্ন হয়। ইহাদের কেহ বা বিশিষ্টজাতীয় তরল পদার্থে দ্রবীভূত হইতে পারে, কেহ বা ঐ গুণ পায় না। যাহারা কোন দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় তাহাদিগকে দ্রাবকের

সহায়তায় পরিপূরক পদার্থের সহিত মিশ্রিত করা হয়। কিন্তু যাহারা কোন দ্রাবকেই দ্রবীভূত হয় না, তাহাদিগকে শুষ্ক অবস্থাতে পরিপূরক পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। এইরূপে উৎপাদিত মোল্ডিং মিশ্রণ লইয়া তাহাকে ছাঁচে ফেলিয়া চাপযন্ত্রের সাহায্যে ছাতার হাতল, ঝরনা কলমের খোল, দোয়াতদানি প্রভৃতি বিভিন্ন সামগ্রীর আকার দেওয়া হয়। অথবা ঐরূপ মিশ্রণ হইতে পিচবোর্ডের মত মোটা পাতও প্রস্তুত হইতে পারে। সাধারণ তাপমাত্রায় পদার্থগুলি সহজে আকার বদলাইয়া ফেলিতে পারে, কারণ তখন প্লাসটিক প্রকৃতপক্ষে নমনীয় থাকে। এইজন্য প্রস্তুত সামগ্রীকে একটি বিশিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করিতে হয়। উত্তাপের ফলে রেযিনটি নমনীয়তা হারাইয়া জমিয়া কঠিন রূপ পরিগ্রহ করে। ইহাই 'তাপে কঠিনকরণক্রিয়া' নামে পরিচিত। ফিনল ফরমালডিহাইড রেযিনের তাপসহযোগে কঠিন হইবার গুণ থাকায় তাহার দ্বারা সহজে বহুবিধ আধার নির্মিত হইতে পারে।

ফিনল ফরম্যালডিহাইড রেযিনের আর একটি শ্রেণী, দ্রাবক সাহায্যেও পরিপূরক পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। এইরূপ মিশ্রণ হইতে স্বচ্ছ কাচসদৃশ পাতলা চাদর, নল বা দণ্ড প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। উহাদিগকে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মধ্যে রাখিয়া ১২৫° সেন্টীগ্রেড তাপমাত্রায় প্রায় ৮ ঘণ্টা রাখিলে অথবা অল্পতর তাপে ৪।৫ দিন পর্যন্ত রাখিলে সম্পূর্ণরূপে অনমনীয় কঠিন হইয়া পড়ে। এই শ্রেণীর আর একরূপ রেযিন উদ্বায়ী-জৈব দ্রাবক সহযোগে ল্যাকার ও বার্নিশ-রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা কাচ অথবা ধাতব পদার্থের উপর আস্তর চড়ানো যায়, এইরূপ রেযিন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঁশযুক্ত পরিপূরক পদার্থের সাহায্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার ফলে উহা যেমন দৃঢ় তেমনই ঘর্ষণসহ হয়। আবার কখনও বা পাতলা কাগজের উপর এইরূপ প্লাসটিকের আস্তর জমাইয়া তাহাকে বিদ্যুৎরোধক পদার্থ নির্ম্মাণে কখনও বা শব্দহীন গীয়ার ও বিয়ারিং প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কার্যে নিযুক্ত করা হয়।

ছানা সংযোগেও বিশিষ্ট ধরনের প্লাসটিক নির্মিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে এইরূপ দুইটি প্লাসটিক এরিনয়েড ও ল্যাকটয়েড নামে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার দ্বারা নির্মিত দ্রব্যগুলি দেখিতে অতিশয় সুদৃশ্য ও চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে। ছাতার বাঁট, বিভিন্ন প্রকার ব্রাশের বাঁট, বোতাম, সুদৃশ্য কলমদানি প্রভৃতি নানাবিধ পদার্থ ইহার দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে। প্লাসটিকের জন্য ছানা প্রস্তুত করিতে হইলে দুগ্ধ হইতে স্নেহজাতীয় পদার্থ অর্থাৎ মাখন সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা কর্তব্য। পরে রেনেট সাহায্যে ছানা প্রস্তুত করিতে হইবে। অম্ল পদার্থের দ্বারাও ছানা প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু তদপেক্ষা রেনেট ছানা অধিকতর কার্যকরী। এই ছানার টুকরাগুলি যথাসম্ভব সূক্ষ্ম হওয়া বাঞ্ছনীয়। নচেৎ উহাতে একরূপ ঈষৎ হরিদ্রাভা দেখা দেয়, তাহা পরবর্তী কার্যের জন্য অত্যন্ত আপত্তিজনক। পরে ইহাকে শুকাইয়া তাহার সহিত ইচ্ছানুরূপ রং মিশ্রিত করা হয়। ইহার সহিত গ্লিসারিন বেনজাইন অ্যালকোহল প্রভৃতি তরল দ্রাবক সাহায্যে উহার নমনীয়তাগুণ বৃদ্ধি করা হয়। ইহাকে যন্ত্রমধ্যে চাপ-সাহায্যে ইচ্ছানুরূপ আকার প্রদান করিয়া পরে ফরমালডিহাইডের মধ্যে ডুবাইয়া কাঠিন্য দান করা হয়।

এইরূপে ইউরিয়া ও ফরমালডিহাইড হইতে ইলেকট্রিক সুইচ প্লাগ প্রভৃতি নানারূপ প্রয়োজনীয় সামগ্রী বর্তমানে প্রস্তুত হইতেছে। বহু সংযোগাত্মক বা পলিমেরিকা রেযিন মধ্যে গ্লিপ-টালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইহা থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড ও গ্লিসারিন হইতে উৎপন্ন হইতেছে। এই শ্রেণীর আর একটি প্লাসটিকের নাম পার্সপেক্স, উহা হইতে আঘাতসহ জৈবকাচ নামে একটি নূতন শ্রেণীর কাচ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা সহজে ভাঙিবে না, অথচ দেখিতে কাচের ন্যায় সুদৃশ্য।

প্লাসটিক-শিল্প অল্পদিন হইল প্রসার লাভ করিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর দুই-একটি প্লাসটিক প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু তাহা এখনও তেমন প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। আমার মনে হয়, বাঙালী রাসায়নিকের মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহার হইলে আমাদের বাংলাদেশ অদূরভবিষ্যতে প্লাসটিক শিল্পেও পথপ্রদর্শক হইতে পারিবে।

বাংলার কৃষিক্ষেত্রের উৎকর্ষসাধন

বাংলাদেশের সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা রূপ সকলেরই সুপরিচিত। কিন্তু তথাপি আজ সমস্ত দেশব্যাপী খাদ্যাভাবে হাহাকার উঠিয়াছে। ইহার প্রকৃত কারণ কি? যদি বাংলাদেশকে চিরদিন ধরিয়া ব্রহ্ম বা অন্য দেশের চাউলের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়, তাহা হইলে ইহাকে সুফলা দেশ কিরূপে বলিতে পারি? দেখা যাউক, এদেশে কি ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব ও উহার খাদ্যদ্রব্যের অভাব প্রকৃতপক্ষে সত্য অভাব কি না!

পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বাংলাদেশের সমস্ত জমির পরিমাণ ৪,৭৩,৯৩,৪৮৪ একর। উহার মধ্যে কর্ষিত জমি, পতিত জমি, বনভূমি প্রভৃতির পরিমাণ নিম্নরূপ ;—

কৃষিক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত জমি	২,৪৭,২৮,১০০ একর
বর্তমানে পতিত হইলেও কৃষির উপযুক্ত জমি	৫১,২৩,৬২২ "
পতিত জমি	৪৬,৪০,৫৬৯ "
কর্ষণের অনুপযুক্ত জমি	৬২,৯৪,২৪৮ "
বনভূমি	৬,৬০,৬৯৪ "

এই জমির মধ্যে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ২,২৩,৮৭,৯০০ একর জমিতে ধান রোপণ করা হইয়াছিল। ২১,৬৮,৬০০ একর জমিতে পাট ও ৫১,৬৩,৩০০ একর জমি রবিফসলের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু মনে হয়, মোট ২,৯৮,৫১,৭২২ একর জমি কৃষিকার্যের জন্য নিযুক্ত হইতে পারে। অতএব এখনও যথেষ্ট পরিমাণ জমির উপযুক্ত ব্যবহার হইতেছে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

বিভিন্ন বৎসরের উৎপন্ন ফসলের একটি হিসাব দ্বারা প্রমানিত হয় যে, চাউল প্রতি একরে ১৩/০ তেরো মণ হিসাবে পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েক বৎসরের উৎপন্ন ফসলের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইহাই বুঝা যায়। বাংলাদেশে চাউলের জন্য যে জমি কর্ষিত হয়, তাহা হইতে বিভিন্ন বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ চাউল পাওয়া গিয়াছে।

১৯৩৪।৩৫ খ্রীষ্টাব্দে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ কয় বৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অল্প, কিন্তু তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে যে ঐ বৎসর এদেশে মোট ২৬,৯৬,১৬,০০০ মণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষে ১৯৩৮।৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মোট ২,৪৫,৫০,০০০ টন বা ৬৬,২৮,৫০,০০০ মণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, বাংলাদেশে যে পরিমাণ চাউল জন্মায় সমস্ত ভারতবর্ষে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ তাহার প্রায় ২½ গুণ। বাংলাদেশের লোক চাউলই প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। এখানে লোকসংখ্যা যদি গড়ে ৬ কোটি বলিয়া গ্রহণ করা যায় ও প্রত্যেকটি লোক যুবা বৃদ্ধ বালক শিশু নর ও নারী নির্বিশেষে যদি গড়ে ছয় ছটাক করিয়া চাউল আহার করে, তাহা হইলে তাহাদিগের খাদ্যরূপে বার্ষিক ২·২ কোটি মণ চাউল প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাংলাদেশের উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ দেখা যাইতেছে প্রায় ২৭ কোটি মণ। অতএব ইহা ধরিয়া লইতে হইবে যে আমরা নিজের প্রয়োজনীয় চাউল চিরদিন দেশেই উৎপন্ন করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত ১৪ লক্ষ ২৬ হাজার মণ হইতে ১৫ লক্ষ ৭৭ হাজার মণ পর্যন্ত গম ও কিছু যব, ভুট্টা, বাজরা, কাংনা, কোদো প্রভৃতিও এখানে জন্মিয়া থাকে এবং এইসকল শস্য প্রতি বৎসর ভাদ্র-আশ্বিন মাসের চাউলের খরচ অন্তত কিয়ৎ পরিমাণে কমাইয়া দেয়। তবে বহির্দেশ হইতেও চাউল এদেশে বরাবরই আসিয়াছে, এবং সময় সময় রেঙ্গুনের চাউল আসিয়া ক্ষুধার্ত বাঙালীর সাহায্য করিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ ইহাই যে, সাধারণ সময়ে প্রচুর পরিমাণে চাউল বাংলাদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে এবং বাংলার বাহির হইতে যে চাউল এদেশে আমদানি করা হইত তাহা এই রপ্তানিকৃত চাউলের একাংশ পূরণ করিবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে আমাদের উৎপন্ন ফসলের ঘাটতি পূরণ করিতে কোনদিনই বাহির হইতে চাউল আনিবার প্রয়োজন ঘটে নাই। বাংলা-দেশের আমদানি ও রপ্তানির নির্ভুল হিসাব হস্তগত হইলে এই কথার সত্যতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইবে। তাহা না পাইলেও ইহা মানিয়া লইতেই হইবে যে, বর্তমানের হাহাকারের কারণ উৎপন্ন ফসলের ঘাটতি নহে। ইহার অন্য কারণ রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা বৃথা।

বাংলাদেশের লোকসংখ্যার কথা ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এখানে লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারি হইতে জানা যায় যে, ঐ বৎসর এখানকার লোক সংখ্যা ছিল ৪,৭৬,০০,৬২৮; কিন্তু দশ বৎসর পর ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে উহা ৫,১৫,১৪,০০২ হয়, আরও দশ বৎসর পর ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ৬,১৪,০০,৩৭৭ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এই অনুপাতে আমাদিগের প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণও বাড়িয়া যাইবে। এই ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই দেখা যাইতেছে—ক্রমাগত অধিকতর পরিমাণ জমিতে আমরা ধানের চাষ করিয়াছি। ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠার তালিকায় উহা অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু ক্রমাগত এইরূপে অধিকতর পরিমাণ জমিকে চাষের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব নয়, কারণ আমাদের প্রয়োজনানুযায়ী জমির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া যাইবে না। অতএব জমির উৎপাদনী শক্তি বাড়াইয়া ফসলের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, ক্রমাগত উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ কিরূপে বাড়ানো সম্ভব? এই বিষয় ভাবিয়া দেখিলে ফসল উৎপাদনের পথে যে তিনটি বিশেষ বাধা রহিয়াছে, তাহার কথা বিবেচনা করিতে হইবে ও ঐ বাধা অতিক্রম করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ত্রিবিধ বাধাগুলি এইরূপ। প্রথমত যদি চাষীর সংখ্যা বা তাহাদের পরিশ্রমের ক্ষমতা কমিয়া যায় তাহা হইলে চাষ উপযুক্তমত হইবে না, তাহার ফলে উৎপন্ন দ্রব্যও আশানুরূপ পাওয়া যাইবে না। দ্বিতীয়ত জমির উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারিলে ক্রমাগত ইহার সারভাগ কমিয়া যাইবে। সারই ফসলের প্রাণস্বরূপ। যদি উপযুক্তমত সার জমিতে না দেওয়া যায়, তাহা হইলে জমির উৎপন্ন ফসল আশানুরূপ হইবে না এবং তৃতীয়ত মরসুমী আবহাওয়ার উপর এদেশের ফসলের ফলন বহুলপরিমাণে নির্ভর করে। এই দেশই বোধ হয় একমাত্র দেশ যেখানে মানবের চেষ্টা দ্বারা ফসলের জল সরবরাহ একেবারেই হয় না, পরন্তু স্বাভাবিক উপায়ের উপর মানুষ সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এইজন্যই এদেশে ফসলের উৎপাদনসমস্যা বহুল-পরিমাণে অনিশ্চয়তার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। অখণ্ডনীয় ভবিতব্যের

ধারণা আমাদের মধ্যে এরূপ ভাবে প্রকট না হইলে আমার মনে হয় আমরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত অধিক তৎপর হইতাম ও বর্তমান অপেক্ষা অধিকতর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য পাইতে পারিতাম।

উপরোক্ত এই ত্রিবিধ কারণই আমাদের বর্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী।

প্রথমত লোকগণনার ফলে জানা যায় যে, এদেশে চাষীর সংখ্যা কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। কিন্তু নানাবিধ কারণে দেশের চাষীদিগের স্বাস্থ্যের হানি ঘটিয়াছে। উপযুক্ত খাদ্যাভাব তো বরাবরই ছিল। অধিকন্তু ক্রমে পরিবার বৃদ্ধির সহিত তাহাদিগের সীমাবদ্ধ আয়ের কোন প্রসার হয় নাই। যাহা পূর্বেই তাহারা পাইত তাহাই পরিমাণ কমাইয়া সকলে ভাগ করিয়া খাইয়াছে। এইরূপ অল্পাহারের ফলে ক্রমে ক্রমে তাহাদের দেহ নিস্তেজ হইয়া আসে, তদুপরি রোগের অত্যাচার তাহাদের দুর্বল দেহকে জরজর করিয়া চলিয়াছে। এইসব কারণেই তাহাদের পরিশ্রম করিবার শক্তি ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে। কাজেই চাষও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিতেছে না। এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া সকলেরই কর্তব্য, অতএব চাষীর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সকলকেই কিছু সাহায্য করা দরকার।

দ্বিতীয় বিষয়টি আরও গুরুতর। একই জমিতে বৎসরের পর বৎসর চাষ করিয়া আমরা ফসল উৎপাদন করিতে চাই। কিন্তু ফসলেরও যে উপযুক্ত আহার্য দরকার সে কথা আমরা ভুলিয়া যাই। এদেশে শ্রেষ্ঠ জমিতে ধান জন্মায় বিঘা-প্রতি ১০ হইতে ১৪ মণ পর্যন্ত। জলের অভাব ঘটিলে এই পরিমাণ ধানও পাওয়া যায় কন্তু আমেরিকার ন্যায় দেশে তাহারা ধানের চাষ করিয়া দেখিয়াছে যে, বিঘা-প্রতি অন্তত ত্রিশ মণ ফলানো মোটেই কঠিন কাজ নহে। তাহারা জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ সার দিতে অবহেলা করে না, একটি ফসলের পর আর একটি ফসল লইবার পূর্বে জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ সার দিয়া তবে দ্বিতীয় ফসল রোপণ করে। আমরা আমাদের দেশব্যাপী দারিদ্র্যের মধ্যে সর্বদাই অল্প খরচে লাভবান হইতে চাই বলিয়া সারকে তেমন দরকারী মনে করি না, কিন্তু

বিভিন্ন বৎসরে কৃষির জন্য নিয়োজিত

ফসলের নাম	১৯৩৩—১৯৩৪		১৯৩৪—১৯৩৫	
	জমির পরিমাণ	ফলন	জমির পরিমাণ	ফলন
চাউল	২১৬৭২৫০০ একর		২০৭৩৯৭০০ একর	
(১৩/ মণ)		২৮২৭ ২৫০০/ মণ		২৬৯৬১৬১০০/ মণ
গম	১৪৫৫০০ একর		১৫৪৭০০ একর	
(৯.৮/ মণ)		১৪২৫৯০০/ মণ		১৫১৬৩৬০/ মণ
যব, বাজরা,	৮৪৮০০ একর		৯১৩০০ একর	
ভুট্টা ইত্যাদি	৫৯০০ "		৬২০০ "	
	২৩০০ "		২১০০ "	
ছোলা	১৭৪৯০০ একর		২০৬৯০০ একর	
(১০.২/ মণ)		১৮১৯৯৬০/ মণ		২১১০৩৮০/ মণ
সরিষা	৬৯৩৪০০ একর		৭২৩৮০০ একর	
(৭.১/ মণ)		৪৯২৩১৪০/ মণ		৫১৩৮৯৮০/ মণ
তিল	২৫৭৯০০ একর		১৫৮৫০০ একর	
(৭.১/ মণ)		১১৩৬৮৮০/ মণ		১১৩৭৩০০/ মণ
তিসি	১২৩৮০০ একর		১২৫৮০০ একর	
(৬.৯/ মণ)		৮৯৫৬২০/ মণ		৮৬৮০২০/ মণ
তুলা	৫৮০০০ একর		৫৮০০০ একর	
(১.৫/ মণ)		৮৭০০০/ মণ		৮৭০০০/ মণ
পাট	২১৪২৩০০ একর		২১৬০৪০০ একর	
(১৭.৪/ মণ)		১৪৬৯৭৬০২০/ মণ		৩৭৫৯০৯৬০/ মণ
ইক্ষু	২৫৬৬০০ একর		২৭৬২০০ একর	
(৫৫.৫/ মণ)		১৪২৪১৩০০/ মণ		১৫৩২৯১০০/ মণ

জমি ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের তালিকা

১৯৩৫—১৯৩৬		১৯৩৬—১৯৩৭		১৯৩৭—১৯৩৮	
জমির পরিমাণ	ফলন	জমির পরিমাণ	ফলন	জমির পরিমাণ	ফলন
২১০৯১৯০০ একর	• ১২৭৪১৯৪৭০০/ মণ	২১৯৯২৫০০ একর	২৮৫৯০২৫০০/ মণ	২২২০০৫০০ একর	২৮৮৬০৬৫০০/ মণ
১২৭১০০ একর	১২৪৫৫৮০/ মণ	১৪৯৫০০ একর	১৪৬৫১০০/ মণ	১৬০৯০০ একর	১৫৭৬,২০/ মণ
৯০০০০ একর		৯৫০০০ একর		৯৫০০০ একর	
৫৬০০০ "		৬১০·০ "		৫৮০০০ "	
২০০০ "		:২১০০ "		২০০০ "	
১৮২৯০০ একর	১৮৬৫৫৮০/ মণ	২৪১৯০০ একর	২৪৬৭৩৮০/ মণ	২৭৯৫০০ একর	২৮৫০৯০০/ মণ
৭১০৭০০ একর	৫০৪৫৯৭০/ মণ	৭৪০২০০ একর	৫২৫৫৪২০/ মণ	৭৭০৭০০ একর	৫৪৭১৯৭০/ মণ
১৬৫১০০ একর	১১৮৮৭২০/ মণ	১৮৩৪০০ একর	১৩২০৪৮০/ মণ	২০৯৭০০ একর	১৫০৯৮৪০/ মণ
৯৮২০০ একর	৬৭৭৫৮০/ মণ	১৩০৬০০ একর	৯০১১৪০/ মণ	১৩৭০০০ একর	৯৪৫৩০০/ মণ
৫৭৯০০ একর	৮৬৮৫০/ মণ	৫৮১০০ একর	৮৭১৫০/ মণ	৫৮০০০ একর	৮৭০০০/ মণ
২৬৭০৩০০ একর	৪৬৪৬০২২০/ মণ	২১৫৪৮০০ একর	৩৭৪৯৩৫২০/ মণ	২১৬০৯০০ একর	৫৭৬৯৯৬৬০/ মণ
৩২৫৪০০ একর	১৮০৫৯৭০০/ মণ	৩৫৪৮০০ একর	১৯৬৯১৪০০/ মণ	২৯০১০০ একর	১৬১০৫৫৫০/ মণ

সারের পরিমাণ উপযুক্ত মত বাড়াইতে পারিলে ফসলের পরিমাণও বাড়িবে সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই।

পূর্বে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সার প্রস্তুতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। ঐ সকল উপায়ে যে সার পাওয়া যাইবে তাহার দ্বারা বহু জমিকে সারবান করা যাইতে পারে। গোময় অতি উত্তম সার। এদেশে গোপালন তেমন যত্নের সহিত সম্পাদিত হয় না। গোপালন ব্যবস্থার উন্নতি প্রয়োজন। গোপালন দ্বারা যেমন প্রচুর সার পাওয়া যায়—তেমনই উহাদের সাহায্যে আরও বহুবিধ দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব। গোপালন বা পশুপালন সম্বন্ধে এইজন্য ভিন্নভাবে আলোচনা করিলাম। যাহা হউক, এই গোময়ের পরিমাণ বাড়াইয়া এবং বর্তমানে যাহা পাওয়া যাইবে তাহাকেও উপযুক্ত উপায়ে রক্ষা করিয়া সারের প্রাচুর্য হইতে পারে।

অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, আমরা ঐ সম্বন্ধে মোটেই তেমন সজাগ থাকি না। যদি সারের ব্যবস্থা ঠিকমত করা যায়, তাহা হইলে ফসলের পরিমাণ দেড় হইতে দুই গুণ পর্যন্ত বাড়াইতে পারা যাইবে।

সারের সহিত উপযুক্ত প্রথায় চাষের কথা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। চাষকার্যও অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথানিয়মে সম্পাদিত হয় না। হল চালনার সময় গভীরভাবে মৃত্তিকাকে নাড়িয়া না দিলে নিচের মাটি উপরে উঠিতে পারে না। নিচের মাটিকে উপরে আনয়ন করাই চাষের প্রধান কর্তব্য। ইহার দ্বারা দ্বিবিধ উপকার পাওয়া যায়। প্রথমত নিম্নস্থ মাটি যাহার মধ্যে অধিকতর সারবস্তু জমা হইয়াছে, তাহা উপরে উঠিয়া আসে, দ্বিতীয়ত নিচের মাটি বাতাসের সহিত মিলিত হওয়ায় উহার মধ্যে বাতাস আবদ্ধ হইয়া যায়। এই বাতাস গাছেরা শিকড় সহযোগে গ্রহণ করে ও উহার সাহায্যে জমির মধ্যস্থিত জৈব পদার্থ পরিবর্তিত হইয়া উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী আহারে পরিণত হয়। সার উদ্ভিদের খাদ্য; তাহা প্রধানত জলে দ্রবীভূত অবস্থায় উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করে। এই জলীয় দ্রবণের যে অংশ অধিকতর নিম্নে চলিয়া যায়—তাহা আর গাছের খাদ্য হিসাবে গৃহীত হইতে পারে না, কারণ ছোট ছোট উদ্ভিদের শিকড় নিম্নে অধিকদূর যাইতে সক্ষম হয় না। কাজেই

অধিকতর নিম্নদেশে যে খাদ্য গিয়া জমিয়াছে, তাহাকে ভূমি কর্ষণ করিয়া উপরে আনিতে হইবে। এই কার্য দ্বারা মাটিকেও হালকা করিয়া ফেলা হয়, যাহাতে শিকড় সহজে দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে।

আমাদের বর্তমান ভূমি কর্ষণের যন্ত্র বা লাঙ্গল তেমন গভীরভাবে মৃত্তিকা আলোড়িত করিতে পারে না। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বর্তমানে সরকারী আদর্শ কৃষিক্ষেত্রগুলিতে উন্নততর লাঙ্গল ব্যবহৃত হইতেছে। এই লাঙ্গলের বহুলপ্রচলন প্রয়োজন। উহা দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা অধিক ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও উহার জীবনকাল দীর্ঘতর বলিয়া প্রকৃতপক্ষে ব্যয় অধিক হয় না, অতএব এ বিষয়েও আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে।

তৃতীয়ত মরসুমী আবহাওয়ার কথা। নানা কারণে আমাদিগকে অনিশ্চয় বৃষ্টিধারার জন্য পথ চাহিয়া কৃষিকার্য পরিচালন করিতে হয়। প্রথমত আমরা অত্যন্ত ভাগ্যনির্ভরশীল। মনে করি ভবিতব্যকে খণ্ডানো যায় না। কাজেই যাহা হইবার তাহা হইবেই। কিন্তু ইহাই কি সত্য? যদি তাহা সত্য হইত তাহা হইলে মানুষের চেষ্টা বা পরিশ্রমের কোন মূল্যই থাকিত না। কিন্তু আমরা সর্বদা দেখিতেছি যে, কোন ব্যক্তি অধিক পরিশ্রম করিলে সে অল্পপরিশ্রমী ব্যক্তির তুলনায় অধিক আয় করিয়া থাকে। এইরূপ চেষ্টার ফলেই পাশ্চাত্ত্য দেশ ধীরে ধীরে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়া চলিয়াছে, আর আমরা অদৃষ্টবাদীর দল জড়ত্ব প্রাপ্ত হইতেছি। আমাদের পূর্ব্বতন উজ্জ্বল কীর্তিকাহিনী ভুলিয়া ক্রমে আমরা অধঃপাতের নিম্নতম খাদে নামিয়া চলিয়াছি। চেষ্টা দ্বারা আমাদিগের বর্তমান দুরবস্থার প্রতিকার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই চেষ্টার ফলে আমরা কি করিতে পারি? করা যায় অনেক কিছু। এজন্য সমস্ত ব্যাপার ভাবিয়া দেখিতে হইবে, ও যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। অনেকে বলিবেন, হাঁ, তাহা তো বুঝিলাম, কিন্তু এই চেষ্টা দ্বারা কি আমরা নির্দিষ্ট দিনে বৃষ্টি আনিতে পারিব? হঠাৎ অতিবৃষ্টি হইলে দেশকে কি বন্যার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিব? ইত্যাদি। হয়তো তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব নহে, কিন্তু একেবারে অসম্ভব বলিয়াও আমার মনে হয় না। দেশের মরসুমী

পরিবর্তন নির্ভর করে দেশের বন জঙ্গল ও জলার উপর। বাংলাদেশের উদ্ভিজ্জসম্ভার পূর্বে যাহা ছিল, বর্তমানে তাহা নাই। ইহা অতি সত্য কথা যে, দেশের হাওয়ার মধ্যে জলীয় বাষ্পের অংশ বহুলাংশে বৃক্ষরাজির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা অতীত কালের বহু বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু তাহার স্থানে নূতন বৃক্ষ রোপণ করি নাই। দেশের দক্ষিণাংশে বিরাট সুন্দরবন অবস্থান করিয়া এ দেশের বাতাসকে যে জলীয় বাষ্প প্রদান করিত—অরণ্য কাটিয়া আমরা সে জলীয় বাষ্প হইতে দেশকে বঞ্চিত করিয়াছি। অথচ তাহার পরিবর্তে নূতন অরণ্য প্রবর্তন করি নাই। তেমনই গ্রামে গ্রামে বৃক্ষাদির অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আবার এই বৃক্ষরাজির অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিলে বোধ হয় বহুলপরিমাণে বৃষ্টির অনিশ্চয়তা দূর করিতে পারিব। তারপর প্রয়োজনবোধে অব্যবহার্য পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া, কোথাও বা নহর কাটিয়া, কোথাও কূপ খনন করিয়া অথবা নলকূপ বসাইয়াও বর্ষার অনিশ্চয়তার জন্য ক্ষতি হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারি। তারপর অতিবর্ষার হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য জলনিকাশের পথগুলি উন্নততর অবস্থায় লইয়া যাইতে হইবে। এই সকল কার্য সম্পাদন করিতে পারিলে তৃতীয় অভাবটিও বহুলাংশে মিটানো যাইবে।

বন্যার অত্যাচারের কথা মনে হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে দামোদরের উৎপাতের কথা মনে হইল। দামোদরের বন্যা বর্ধমান ও হুগলি জেলার বহু ক্ষতিসাধন করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিতে পারে। এই নদটি হাজারিবাগ জেলার উচ্চ গিরিগাত্র হইতে নির্গত হইয়া অপেক্ষাকৃত অল্প দূরেই প্রায় সমুদ্রতলের সমানতলবিশিষ্ট ভূমির উপর আপতিত হইয়াছে। পশ্চিমে অর্থাৎ হাজারিবাগ জেলার মধ্যে অতিবৃষ্টি হইলেই দামোদর অতি অল্পকাল মধ্যেই ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠে। এই বারিধারা প্রচণ্ডবেগে বিপুল স্রোতরূপে দামোদরবক্ষ ভাসাইয়া চলে। এই জলধারার ভীষণ শক্তি প্রতিহত করিয়া দামোদরের দুষ্কৃতি হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে দুইটি উপায় গৃহীত হইতে পারে। হয় হাজারিবাগের জলধারাকে অন্তত সাময়িকভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

নহে তো ঐ জলধারা নিম্নভূমিতে নামিলে তাহাকে দ্রুত নিষ্কাশিত করিয়া ফেলিতে হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, দামোদরের জল যখন বঙ্গভূমির উপর আপতিত হয়, তখন উহা প্রায় সমুদ্রতলের সহিত সমতল ভূমিতে পড়ে। কাজেই এই জলকে সহজে বাহির করা সম্ভব নয়। অতএব দ্বিতীয় উপায়ে ঐ জল নির্গত হইতে পারিবে না। এখন যদি নদীবক্ষে নামিবার পূর্বে ঐ জলধারাকে ধরিয়া সুবৃহৎ জলাধার মধ্যে আবদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ঐ প্রচণ্ড বেগকে মন্দীভূত করা সম্ভব। এই জলধারাকে আবদ্ধ করিয়া বৃহৎ জলাধার স্থাপন করা সম্ভব—সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ঐরূপ জলাধার হইতে সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া দামোদর-বক্ষে জল চালিত হইতে পারে। ইহার ফলে নদীর উভয় পার্শ্বস্থিত বর্তমানের উষর ক্ষেত্রগুলি শস্যপূর্ণ হইয়া উঠিবে। কেবল এই নদীর উভয় তট নহে, নদী হইতে একাধিক নহর কাটিয়া অধিকতর স্থানকে জলদানে শস্যশালী করিতে পারা যাইবে। এই ভবিষ্যতের সম্ভাবনাটিকে সত্যে পরিণত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি অধিবাসীর আন্তরিক চেষ্টা প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গে আরও কতগুলি নদী রহিয়াছে—যেমন অজয়, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি, যাহারা সাঁওতাল পরগণায় অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি হইতে জলধারা আহরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার অংশবিশেষকে প্লাবিত করিয়া থাকে। এই নদীগুলির অত্যাচার কেবল উহাদিগের দেহ হইতে কতকগুলি নহর কাটিয়া লইয়া গেলেই যথেষ্টরূপে প্রশমিত হইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। এই নহর কাটিতে পারিলে আরও অনেক জমিকে সমস্ত বৎসর ধরিয়া শস্যশ্যামলা করিতে পারা যাইবে।

নহর ব্যতীত আরও একটি বিষয়ের কথা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। আমার মনে হয়, বীরভূম অঞ্চলের স্থানবিশেষ যথেষ্ট উচ্চ বলিয়া তথায় প্রায় প্রতি বৎসর জলের অভাব ঘটে। ঐ সকল স্থানে কূপ বা নলকূপ স্থাপন করিতে পারিলে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারিবে। উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। পূর্ববঙ্গে নদীর জল প্রায় সমস্ত বৎসর ধরিয়া পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গেও জলের অভাব সহজেই মিটাইতে পারা

যাইবে। অতএব বাংলাদেশের এই দুইটি অংশের মধ্যেও কৃষির অধিকতর উন্নতি ঘটিতে পারে। মধ্য-বাংলা ও দক্ষিণ-বাংলাকেও নহর কাটিয়া বা বর্তমান শাখানদীগুলিকে পরিষ্কার করিয়া কৃষির জন্য উপযুক্ততর করা যায় ও সেই সঙ্গে ঐ অংশের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি করা যায়।

এই নলকূপগুলি পরিচালন করিতে যে শক্তির প্রয়োজন হইবে—তাহা যদি প্রচণ্ড না হয়—তাহা হইলে কার্যের গতি মন্থর হইয়া চলিবে। যুক্ত প্রদেশে ইতোমধ্যে এই irrigation বা জলসেচনকার্য বিদ্যুৎশক্তি সহযোগে হইতেছে। বিহারেও অল্পকাল মধ্যে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে এইরূপ নলকূপ হইতে জলসেচনকার্য আরম্ভ হইবে—তাহার সূচনা পাওয়া যাইতেছে। বাংলাদেশেও ইহা সম্ভব। পূর্ববর্ণিত উপায়ে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হইলে তথায় অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে নলকূপ হইতে প্রচুর পরিমাণে জল বিদ্যুৎশক্তি সাহায্যে উত্তোলিত হইয়া কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে।

বর্তমানে যে সকল জলাশয় মাঠে থাকিয়াও কোনরূপ কাজে লাগিতেছে না, তাহার প্রতিও দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। পঙ্কোদ্ধার করিলে উহারা যে কেবল ক্ষেত্রে জলদান করিবে, তাহাই নহে; উপরন্তু ঐ সকল পুষ্করিণীতে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য জন্মানো যাইবে। পশ্চিমবঙ্গে মৎস্যের চাষ অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে বলিয়া তথায় ইহার অভাব রহিয়াছে। এই দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের খাদ্যসমস্যার এক দিকের আংশিক সমাধান হইতে পারিবে। অধিক পরিমাণে মৎস্য উৎপাদন করিতে পারিলে তাহা হইতে অন্য কাজও করা সম্ভব, তবে সে কার্যের জন্য নদীবহুল পূর্ববঙ্গই প্রশস্ততর ক্ষেত্র। ইলিসমাছ সময় সময় এত অধিক পরিমাণে ধরা পড়ে যে, তাহার একাংশ নষ্ট হইয়া থাকে। ইলিসমাছ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ তৈল নির্গত হয়; এই তৈল কডলিভার তৈলের ন্যায় ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এবং মৎস্যদেহের অন্য অংশ হইতেও কার্যকরী পদার্থ ও জমির জন্য উত্তম সার পাওয়া যাইতে পারে। এই সমস্ত ব্যাপারের যথোপযুক্ত উন্নতি হইলে এদেশে কখনই

শস্যের অভাব ঘটিবে না। পরন্তু অধুনা যে সকল জমির ব্যবহার হইতেছে না, সেগুলিকে যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগাইলে অন্য শ্রেণীর ফসল উৎপাদন সম্ভব হইবে। বাংলাদেশের কৃষিজাত বিভিন্ন পণ্যের কথা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইল।

বাংলার কৃষিজাত পণ্যের কথা

কৃষিজাত পণ্যকে কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। পশুর ব্যবহার কৃষির জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। ইহাকেই প্রথম স্থান দিয়া তাহার বিবরণ দিব। পরে ক্ষেত্র হইতে যে সকল ফসল জন্মায় তাহাদের কথাও আলোচনা করিব। খাদ্যশস্য গোধূম, ধান্য ইত্যাদি যেমন এই শ্রেণীর অন্তর্গত, তৈল-প্রদায়ী বীজ, ইক্ষু, সব্জি, ফলবৃক্ষ এবং ঔষধের জন্য ব্যবহারযোগ্য উদ্ভিদও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে। বাংলার কৃষিক্ষেত্রে সর্ববিধ ফসল উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু সকল প্রকার ফসলের পরিবর্তে যে সকল ফসল দ্বারা আমাদের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে, তাহার কথাই বর্তমানে আলোচনা করিব।

পশুপালন, ক্ষেত্রের সার সরবরাহের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। গৃহপালিত পশু ও পক্ষীর বিষ্ঠা জমিতে দিলে তাহা উত্তম সারের কার্য করে। এই পদার্থটি কিছুদিন থাকিলে জল ও বাতাসের সহিত মিলিয়া ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে থাকে। এই বিষ্ঠাজাতীয় পদার্থ যে নাইট্রোজেন, অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সহিত মিলিত রহিয়াছে তাহা ক্রমে অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয়। অ্যামোনিয়া পরে অন্য পদার্থে পরিণত হইতে থাকে। অথবা বিষ্ঠা হইতে প্রথমে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা ক্রমে অ্যামোনিয়ায় পরিবর্তিত হইতে থাকে। অ্যামোনিয়া গ্যাসীয় পদার্থ, এইজন্য সহজেই উহা বাতাসের সহিত মিলিত হইয়া যাইবে। পশ্বাদির বিষ্ঠা এইজন্য খোলা জায়গায় শুষ্ক অবস্থায় ফেলিয়া রাখা উচিত নহে। খুলিয়া রাখিলে অ্যামোনিয়ার ন্যায় পদার্থ সহজে উড়িয়া

যাইতে পারে, অন্যথায় এরূপ পদার্থ অন্যান্য পদার্থের সহিত সারের মধ্যে থাকিয়া যাইবে। অবশ্য এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখা কর্তব্য যে, সারগাদায় যদি বাতাসের যাতায়াত একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে বিষ্ঠাদির বিশ্লেষণক্রিয়া সহজে সংঘটিত হইবে না। কাজেই দেখিতে হইবে যে, বাতাসের যাতায়াত যেন বন্ধ না হইয়া যায়। এ দেশে দেখিতে পাই অধিকাংশ স্থানে সারকুঁড়ার কোনরূপ যত্ন লওয়া হয় না, কাজেই আমাদের গোবর সারেও উপযুক্ত পরিমাণ ফলপ্রদ পদার্থ থাকে না। পশ্বাদির মূত্রও উত্তম সার, উহা হইতেও প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। মানবমূত্রেও ঐরূপ পদার্থ পাওয়া যাইবে। এই সকল তরল সার যথানিয়মে আহৃত হইয়া উপযুক্ত পাত্রে রক্ষিত হইলে তাহার দ্বারাও মাটিকে সারবান করা সম্ভব। এ বিষয়ে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, মূত্র তরল পদার্থ বলিয়া উহাকে সহজে রক্ষা করা যায় না। যদি আবৃত স্থানে গর্ত কাটিয়া উহার মধ্যে এই মূত্র আহৃত হয় ও প্রতি তিন দিন পর পর ঐ তরল পদার্থকে উপযুক্ত পরিমাণ শুষ্ক ছাই বা মাটি দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উহার সারভাগ রক্ষিত হইয়া থাকিবে। উহা প্রতি এক মাস বা দেড় মাস অন্তর জমিতে দিয়া মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দিতে হইবে। এই সার সজিক্ষেত্রের জন্য বেশ উপকারী।

পশু পালন করিতে গেলে পশুর পরিত্যক্ত এই মলমূত্র যেমন জমির জন্য কাজে লাগিবে, তেমনই উহার দেহও নানাবিধ উপকারে আসে। গবাদি পশুর দুগ্ধ মানবের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। পূর্বে এ দেশে দুগ্ধ, ঘৃত, ননী, মাখনের অভাব ছিল না। এমন কি দরিদ্র-গৃহেও এই পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইত। আজ অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে। আমরাও পশুর যত্ন লইতে পারি না, কাজেই তাহারাও আমাদিগকে উপযুক্তমত খাদ্যসামগ্রী প্রদান করিতে পারে না। গৃহপালিত পশুর উপযুক্ত যত্ন করা প্রত্যেক বাঙালীর অবশ্যকর্তব্য। দুঃখের বিষয় এই যে, গাভী যে দেশে দেবতা বলিয়া পূজিত হয়, সেই দেশেই গাভীর অযত্ন সর্বাপেক্ষা অধিক। দেশের গরু বাছুর দেখিয়া কে বলিবে যে সত্যই

এ দেশে লোক গাভীর জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করে। অথচ পাশ্চাত্ত্য দেশে যেখানে লোক গো-খাদক বলিয়া এ দেশের লোকের নিকট ঘৃণা অর্জন করিয়াছে ও ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহাদের দেশে কিন্তু গবাদি পশুর যথেষ্ট পরিমাণে যত্ন লওয়া হইয়া থাকে। বলদ না হইলে এ দেশে চাষের উপায় নাই, অথচ ঐ বলদগুলিকে অনাহারে ও অল্পাহারে এরূপ অবস্থায় রাখা হয় যে উহাদের খাটিবার জন্য দৈহিক শক্তি মোটেই থাকে না। প্রতি গৃহে পালিত পশুদিগকে যথেষ্ট আহার প্রদান করা কর্তব্য। পশুর আহার খড় বা বিচালির পরিমাণ যথেষ্ট না হইলে তাহাদের জন্য ঘাস অথবা অন্য জাতীয় উদ্ভিদ জন্মাইতে হইবে। সাধারণত দেখা যায় পশুর খাদ্য ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাসেই কম পড়ে। ঐ সময়ের জন্য অপেক্ষাকৃত অনুর্বর ডাঙা জমিতে ভুট্টা, কুড়মি প্রভৃতি শস্যের চাষ করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি যথেষ্ট বড় হইয়া গরুর খাবার উপযুক্ত হইয়া উঠিবে। নেপিয়ার ঘাসও ঐ সময় বেশ ভাল জন্মায়, উহাও গবাদি পশুর উত্তম খাদ্য। বিচালির অভাব এইসব পদার্থের সাহায্যে পুরণ করা তেমন কঠিন হইবে না।

গাভীর পরিচর্যা ব্যবসায়ের জন্যও করা দরকার। প্রত্যেক গ্রামে অন্তত একটি করিয়া গোপালনক্ষেত্র বা ডেয়ারি স্থাপন করিলে দেশের শিশুদিগের জন্য যেমন সুখাদ্য সরবরাহ করা যায়, তেমনই অবিক্রত উদ্বৃত্ত দুগ্ধাংশ হইতে মাখন তুলিয়া, ছানা কাটিয়া, ঘোল মারিয়া নানাবিধ পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে। কোথাও বা দুগ্ধ হইতে জমানো দুগ্ধ, মাখন, পনীর ইত্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে। এইসকল পদার্থ যেমন মানুষের আহার্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তেমনই উহার অন্য ব্যবহারও রহিয়াছে। ইংলণ্ডের ন্যায় দেশে যেখানে লোকের প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্যশস্য অথবা মাংস-খাদ্য যথেষ্ট পাওয়া যায় না, সেখানেও দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ছানা বা কেযিন বহুলপরিমাণে প্লাসটিকশিল্পে ব্যবহৃত হইতেছে। অতএব আমাদের দেশেও প্রয়োজনাতিরিক্ত কেযিন প্রস্তুত হইতে পারে। গাভীর উপযুক্ত পরিচর্যা করিলে ভাল ষাঁড় অন্য প্রদেশ হইতে আনাইয়া এ দেশের গাভী হইতেও উন্নততর শ্রেণীর বাছুর জন্মানো যায় এবং গাভীর দুগ্ধও

বাড়ানো সম্ভব হয়। এ দেশ হইতে একটু পশ্চিমে গেলেই উন্নতশ্রেণীর ষাঁড় ও গাভী পাওয়া যাইবে। ঐ গাভী ও ষাঁড় এদেশে আমদানি করিয়াও গোপালনক্ষেত্র স্থাপন করা সম্ভব। এ বিষয় লইয়া খুব অল্পসংখ্যক লোকই চিন্তা করিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কাজ কেহই এযাবৎ করেন নাই। নিশ্চেষ্ট বাঙালীর এ বিষয়ে সত্বর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

ডেয়ারি হইতে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থের বহুল প্রচার ঘটিতে পারে। এ দেশ হইতে ভাল মাখন প্রায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। এখন মাখনের পরিবর্তে বিদেশী ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম মাখন বিক্রয় করিয়া চলিয়াছে। কৃত্রিম মাখনের খাদ্যগুণ অতিশয় নিকৃষ্ট। অথচ আমরা ঐ নিকৃষ্ট পদার্থই খাদ্যহিসাবে ব্যবহার করিতেছি। হয়তো কেহ কেহ বলিবেন, মাখন এ দেশীয় জীবনযাত্রার জন্য তেমন প্রয়োজনীয় নহে। মানিয়া লইলাম। কথাটি সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিকভাবে সত্য, সমস্ত বাঙালী জাতি মাখন ব্যবহার না করিলেও তাহাদের অনেকেই নূতনতর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হওয়ায় এই পদার্থটির প্রয়োজন অন্তত কিয়ৎ পরিমাণে হইয়াছে। এ প্রয়োজনও আমাদিগকে বাংলা হইতেই মিটাইতে হইবে। বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ঘৃতের প্রয়োজন যথেষ্ট। এই ঘৃতও এখন আর খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায় না। শতকরা ৮০।৯০টি দোকানে ঘৃতের পরিবর্তে ভেজিটেব্‌ল প্রডাক্ট বা কৃত্রিম ঘৃত মিশ্রিত একটি পদার্থ পাওয়া যায়। উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত খাদ্য নহে। এই পদার্থটি বর্তমানে সমস্ত দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। ঘৃতের অনটনই এই নিকৃষ্ট পদার্থের ব্যবহার বাড়াইয়া তুলিয়াছে। যখন এ দেশে উত্তম ঘৃত পাওয়া যাইত তখনকার দিনে মানুষ দীর্ঘায়ু হইত। বর্তমানে এই সকল কুখাদ্য আহার করার ফলে আমরা ক্রমশ অল্পায়ু হইয়া চলিয়াছি। কাজেই প্রচুর পরিমাণে ঘৃত প্রস্তুত করিলে তাহা সহজেই বিক্রয় করা যাইবে ও আমরাও স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হইব।

ছানাও আমাদিগের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত

হয়। উন্নত প্রথায় বহুলপরিমাণে ছানা প্রস্তুত করিয়া তাহাকে যেমন খাদ্যহিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে, তেমনই উহার দ্বারা একটি রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে পারিবে। এই পদার্থটিকেও বহুলপরিমাণে প্রস্তুত করা উচিত। ইহার সহিত দুগ্ধের চিনি বা ল্যাকটোযও পাওয়া যাইবে। উহাও একটি প্রয়োজনীয় পদার্থ।

দুগ্ধকে ঘন করিয়া যেমন ঘনদুগ্ধ বিক্রয় করা যায়, তেমনই উহাকে দুগ্ধচূর্ণে পরিণত করিয়াও রোগীর ও শিশুর জন্য খাদ্যহিসাবে চালানো যাইতে পারে। এই সকল পদার্থ কেবল দেশেই চলিবে না, উহাকে উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে পারিলে তাহা বিদেশেও রপ্তানি হইতে পারে।

পশুপালনকার্য যথানিয়মে প্রবর্তিত হইলে এইসকল শিল্পশালার প্রতিষ্ঠা সহজেই হইতে পারিবে। এইসকল শিল্প ব্যতীত পশুর মাংস খাদ্যহিসাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ;—মেষ ও ছাগল এইরূপ মাংসের জন্যই বহুল সংখ্যায় নিত্য প্রয়োজন হয়। এইসকল পশুপালনের ব্যবস্থা করাও নিতান্ত প্রয়োজন। পশুর লোম, চামড়া, অস্থি, রক্ত, কোন পদার্থই ফেলিয়া দিবার জিনিস নহে। সব-কিছুই মানুষের ব্যবহারে লাগানো যাইতে পারে। আমরা সচরাচর ধান ব্যতীত অন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে চেষ্টা করি না। অথচ বাংলাদেশের অল্প পশ্চিমে বিহার হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত প্রত্যেক দেশেই আরও নানাবিধ ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। অবশ্য ঐ সমস্ত দেশ ধান্যের জন্য তেমন উপযুক্ত নহে, কাজেই তথায় গোধূম বা গমই প্রধান শস্য। কিন্তু গম ভিন্ন আরও অনেক ফসল তাহারা উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহা সত্যই লজ্জার কথা যে, বাঙালীর ন্যায় অন্য কোনও প্রদেশবাসী সর্ষপতৈল ব্যবহার না করিলেও বাংলায় সরিষার চাষ যথেষ্ট পরিমাণে হয় না। বাঙালীর জন্য সরিষা সরবরাহ করে যুক্তপ্রদেশ। বাংলায় কি ইহার চাষ সম্ভব নহে? আমার তো মনে হয় এই ধারণা অত্যন্ত ভুল যে, ইহার চাষ এখানে হইতে পারে না। অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে যেখানে আমনধানের চাষ সম্ভবপর নহে, সেখানে সরিষার চাষ বেশ ভালভাবেই হইতে পারে, কিন্তু আমরা তাহা করি না। বিহার অঞ্চলে দেখিয়াছি ভাদ্র হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত

চাউলের দর চড়া থাকে। চাষী গৃহস্থ সেই সময় চাউলের পরিবর্তে অন্যান্য খাদ্যশস্য ব্যবহার করিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠের শেষে ভুট্টা বুনিয়া তাহা ভাদ্রে উঠাইয়া লয় ও ভাদ্র মাস ঐ ভুট্টা দ্বারাই তাহারা চালাইয়া লয়। ইহা ব্যতীত কোদো, গোন্ধ্‌লি, বাজরা প্রভৃতি আরও কতকগুলি শস্য তাহারা শ্রাবণ-ভাদ্রে রোপণ করিয়া কার্তিক মাসে কাটিয়া লয়। উহা দ্বারাও তাহাদের দুর্দিনে যথেষ্ট সাহায্য হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙালী কৃষক অন্য ফসলের কথা মোটেই ভাবে না। তাহারা আষাঢ়-শ্রাবণে ধান্য রোপণ করিয়া বসিয়া থাকে। সেই অগ্রহায়ণ মাসে ধান্য উঠিলেই তাহারা পরম সন্তুষ্ট। কিন্তু এদেশেও ব্যাপকভাবে ভুট্টার চাষ হইতে পারে, এবং নানাবিধ রবিফসল তো জন্মানো খুবই সম্ভব। গত বৎসর চাউলের অভাব ঘটিলে রবিফসলের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ফসলও মন্দ হয় নাই। প্রতি বৎসরই এইরূপ গম ছোলা যব প্রভৃতি নানাবিধ রবিশস্য এদেশে জন্মাইতে পারে। তাহা ছাড়া আলুর চাষও ব্যাপকভাবে করা যায়।

আলু, চাউল, যব, ভুট্টা প্রভৃতি শ্বেতসারপ্রধান খাদ্য। শ্বেতসার নানাভাবে বর্তমানে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার সাহায্যে যেমন গ্লুকোয প্রস্তুত হয়, তেমনই ইহা হইতে সুরাসার, অ্যাসিটোন গ্লিসারিন, সাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। আবার বার্লির ন্যায় রোগীর পথ্যও এই শ্বেতসার হইতেই পাওয়া যায়। কাজেই আমরা শ্বেতসার বহু পরিমাণে প্রস্তুত করিতে পারিলে এই সকল পণ্যও এখানে প্রস্তুত করিতে পারিব। আশ্চর্যের কথা এই যে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশ এখান হইতেই শ্বেতসার-প্রধান খাদ্যশস্য লইয়া গিয়া তথায় এইরূপ পণ্য প্রস্তুত করিয়া পুনরায় তাহা অত্যধিক মূল্যে এদেশেই চালান দিয়া থাকে, অথচ আমরা ঐ পদার্থ প্রস্তুত করিতে চেষ্টামাত্র করি না।

বাঙালীর গৃহে চিনির ব্যবহার অল্প নহে। আমরা যে পরিমাণ চিনি ব্যবহার করি, তাহা আমাদের দেশেই জন্মিতে পারে। কিন্তু কে সে চেষ্টা করিয়াছে? একদিন ভারতবাসী ভাবিত, জাভার সহিত চিনি

প্রস্তুত ব্যাপারে তাহারা কখনই প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। অথচ এখন জাভা হইতে চিনি তো এদেশে একেবারেই আসে না। কেবল তাহাই নহে, এখন ভারতবর্ষ হইতে চিনি বাহিরে রপ্তানি হইবার জন্যও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। বাঙালী চেষ্টা করিলে তাহারই চিনির কল হইতে সমস্ত বাংলাদেশকেই চিনি সরবরাহ করিতে পারে। অতএব এদেশে ব্যাপকভাবে ইক্ষুর চাষ হওয়া প্রয়োজন। ইক্ষু হইতে কেবল যে চিনি প্রস্তুত হইবে তাহাই নহে, ইক্ষুর রস নিঙড়াইয়া লইলে যে ছিবড়া পড়িয়া থাকে, তাহাকেও কাজে লাগানো যায়। অবশ্য সাধারণ গুড়ের ব্যবসায়ীরা ঐ পদার্থটি পুড়াইয়া ইক্ষুরস জ্বাল দেয়, কিন্তু তাহা না করিয়া উহাকে কাগজ-প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা শ্রেষ্ঠতর ব্যবস্থা। এই ছিবড়াগুলি সেলিউলোযজাতীয় পদার্থ। সেলিউলোয হইতেই কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে, কাজেই ইক্ষুর ছিবড়ার সহায়তায় মাঝারি আকারের কাগজের কারখানা স্থাপিত হইতে পারে।

ইক্ষুর কল বৎসরের মধ্যে ৪ কি ৫ মাস কাল চলিতে পারে। বাকি সময় উহা বন্ধ থাকে। কর্মীদিগের জন্য অন্য একটি কাজ যদি ঠিক করিয়া দেওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে এই ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ অধিক হইবে। এইরূপ একটি কাজ হইতেছে চিনি বাহির করার পর যে গুড় বা মোলাসেস পড়িয়া থাকে তাহার উপযুক্ত ব্যবহার। এই মোলাসেস সহযোগে ফারমেণ্টেশান শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে সেখানে পাওয়ার অ্যালকোহল, এমাইল অ্যালকোহল, এমাইল অ্যাসিটেট প্রভৃতি কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা ব্যতীত নাইট্রিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড, গ্লিসেরলও ইহারই ফারমেণ্টেশনে পাওয়া যায়। আবার সমস্ত ফারমেণ্টেশনের উৎপন্ন পদার্থ বাহির করিয়া লইলে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাকেও জমির জন্য সাররূপে নিয়োগ করা যায়। যদি চিনির কলের সঙ্গেই এইসকল পদার্থ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে পূর্বোক্ত শিল্পকে অধিকতর লাভবান করিয়া তোলা সম্ভব হইবে।

কার্পাসের চাষ অধিকাংশ বাঙালী ভুলিয়াই গিয়াছে। অথচ

একদিন বাংলার ঘরে ঘরে ইহার চাষ হইত ও চরখার সাহায্যে বাঙালীর বস্ত্র তাহার দেশেই প্রস্তুত হইতে পারিত। আজও সেই দেশ রহিয়াছে, সেই লোকও এদেশে বাস করিতেছে, কিন্তু যন্ত্রযুগের মোহ আমাদিগকে এমনভবে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে যে, আমরা এইসমস্ত কথা এখন ভাবিয়াই দেখি না। পরন্তু মহাত্মা গান্ধী যেদিন দেশকে মুক্তির মন্ত্র চরখার গানের সহিত গ্রহণ করিতে বলিলেন, সেদিন বাঙালীই বোধ হয় তাঁহাকে আদর্শবাদী ও কল্পনাবাদী বলিয়া উপহাস করিল সর্বাপেক্ষা অধিক। আজ আমরা হয়তো তাঁহার কথার সারাংশ কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। আমার মনে হয়, কার্পাসের চাষ ব্যাপক-ভাবে এদেশে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেহ কেহ বলেন, এদেশের কার্পাসের তুলা নিকৃষ্টশ্রেণীর। কিন্তু কৃষির উন্নতি বীজের পরিবর্তন দ্বারাও সাধিত হয়। কেহ কেহ বিদেশী তুলার চাষ এদেশে করিয়াছেন। চেষ্টা করিলে ঐরূপ চাষের ফলে উন্নততর তুলা এদেশেও জন্মানো যাইবে। তুলা জন্মাইলে তাহার শ্রেষ্ঠতর অংশ যেমন বস্ত্রবুননকার্যে নিযুক্ত করা যাইবে, তেমনই নিকৃষ্টতর অংশকে কৃত্রিম রেশমে পরিণত করিয়া উন্নততর বস্ত্রের নির্মাণ সম্ভব হইবে। কেন যে আমরা এ বিষয়ে চেষ্টা করি না, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত। আমি তো মনে করি, এখনই এ বিষয়ে চেষ্টা আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন। এই কাজটির জন্য যুদ্ধোত্তর কালের অপেক্ষা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

পূর্বে পশুপালন বিষয়ে বলিয়াছি, পশুর অস্থিচর্ম সকলই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। পশুদেহ হইতে যে স্নেহপদার্থ পাওয়া যায়, তাহাও কম প্রয়োজনীয় নহে। এদেশেই বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া হইতে বীফট্যালো মাটন সোয়েট ও লার্ড প্রভৃতি নানাবিধ চর্বি আমদানি হইয়া থাকে। এদেশেই ঐসমস্ত উৎপাদন করিলে তাহাই তখন বহু পরিমাণে সাবানশিল্পে নিযুক্ত হইতে পারিবে। উহা ব্যতীত কৃষিক্ষেত্র হইতেও নানাবিধ তৈলবীজের চাষ করিয়া তৈল উৎপাদন করিতে পারিলে তাহাকে সাবানশিল্পের কাজে নিযুক্ত করা সহজসাধ্য হইবে।

নানাবিধ ফল কাঁচা ও পাকা অবস্থায় আহার্য হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া

থাকে। সুস্বাস্থ্যের জন্য ফল আহার করা অতীব প্রয়োজন। লণ্ডনে দেখিতাম, প্রত্যেক রেল-স্টেশনে ও রাস্তাঘাটে অধিক ফল ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ বিজ্ঞাপনের আকারে দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, ইংলণ্ডে ভাল ফল মোটেই উৎপন্ন হয় না। তথায় আপেল আসে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া হইতে, কমলা যায় স্পেন ও প্যালেস্টাইন হইতে। সিঙ্গাপুরের কলা এবং আনারস ইংলণ্ডের বাজারেই বিক্রয় হয়, তেমনই আঙুর প্রভৃতি ফ্রান্স ও ইটালি হইতে যায়। মোট কথা নানা দেশ হইতে বিভিন্ন ফল তথায় আমদানি হয়, কারণ উহা জাতীয় স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। বাংলাদেশেও আমরা কতকগুলি ফলের চাষ সহজেই করিতে পারি। এদেশে পশ্চিমের আম; শ্রীহট্ট, দার্জিলিং ও নাগপুরের কমলালেবু প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। বাংলাদেশে আমের চাষ, কলা ও আনারসের চাষ অতি সহজেই হইতে পারে। গোলাপজাম, জামরুল প্রভৃতিও এদেশে বেশ জন্মায়। কিন্তু কোথাও ইহাদের উৎপাদনকার্য ব্যাপক-ভাবে হয় না, অথবা উন্নততর শ্রেণীর ফলও কেহ জন্মাইতে চেষ্টা করে না। বাংলাদেশে কলা, পেঁপে, আনারস, আম, পাতিনেবু প্রভৃতি নানাবিধ ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া অন্যান্য প্রদেশেও বিক্রীত হইতে পারে। ইহার চেষ্টাও করিতে হইবে।

পরিশেষে ইহাই বলিতে চাই যে, বাঙালীর শ্রীহীন সংসারকে সুন্দর করিতেই হইবে। নানা ভাবে দেশের ধন দেশে রাখিয়া ও এদেশীয় পণ্য বিদেশে পাঠাইয়া বিত্তশালী হইতে না পারিলে ভবিষ্যৎ অত্যন্ত দুঃখময় হইবে।

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক বলিয়া বিবেচ্য। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার প্রকাশিত পুস্তকে বিষয়বস্তুর আলোচনা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ হইতে বিস্তৃততর হইবে।

"শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না।

"বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।"—লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ

১.	বিশ্বপরিচয় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	এক টাকা
২.	প্রাচীন হিন্দুস্থান : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	আট আনা
৩.	পৃথ্বীপরিচয় : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত	বারো আনা
৪.	আহার ও আহার্য : শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য	বারো আনা
৫.	প্রাণতত্ত্ব : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর	এক টাকা
৬.	বাংলাসাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী	পাঁচ সিকা